গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ৩১ সংখ্যা  ১১-১৭ মার্চ ২০১৬  প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর  www.ganadabi.in  আট পাতা  মূল্য ঃ ২ টাকা

## মহান স্ট্যালিন স্মরণে

১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮ - ৫ মার্চ ১৯৫৩

"এই সত্য জেনে রাখা দরকার যে, পার্টি ও রাষ্ট্রের যে বিভাগে যাঁরা কাজ করুন না কেন, কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মান এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধি যত ভাল, যত উন্নত হবে, তাঁদের কাজও তত সুন্দর তত ফলপ্রদ হতে বাধ্য। বিপরীতে, কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মান যত নিচু হবে, মার্কসবাদের উপলব্ধি যত কম হবে, কাজের ক্ষেত্রে ক্ষতি ও ব্যর্থতার সম্ভাবনাও ততই বাড়বে। ততই কর্মীদের চিন্তা ও চরিত্রের গভীরতা নষ্ট হবে। তারা নিছক হুকুম তামিল করার যন্ত্রে পরিণত হবে। এক কথায় তাদের সামগ্রিক অধঃপতনের সম্ভাবনাও ততই বাড়বে।"

*ঊনবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্ট থেকে*

### পুঁজিবাদী শোষণ-অত্যাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে গণআন্দোলন শক্তিশালী করতে

# বামপন্থার মর্যাদা রক্ষার্থে সংগ্রামী বামপন্থী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের জয়ী করুন

## প্রভাস ঘোষ

***কেরালা, আসাম, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রথম দফা প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ যে বক্তব্য রাখেন, সেই পূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করা হল।***

পণ্ডিচেরি সহ পাঁচটি রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমরা চারটি রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। তামিলনাড়ুতে তিনটি আসনে আমরা লড়ছি। সেখানে সিপিএম সিপিআই আমাদের সাথে ঐক্যে আসেনি। তারা কিছু আঞ্চলিক দলের সাথে ভোটের ঐক্য করেছে। আসামে ২৭টি আসনে আমরা লড়ছি। কেরালায় আগে থেকেই আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি), আরএমপি এবং এমসিপিআই(ইউ) এই তিনটি দল নিয়ে আমাদের একটা লেফট ফ্রন্ট আছে, সেখানে আমাদের দলের থেকে ৩১টি আসনে আমরা লড়ছি। পশ্চিমবাংলায় আমরা সমস্ত জেলা মিলে লড়ছি ১৬২টি আসনে (পরে আরও বেড়েছে)। সিপিআইএমএল (লিবারেশন) আমাদের সাথে আলোচনা করছে। আশা করা যায়, পশ্চিমবাংলায় আমাদের সাথে তাদের একটা বোঝাপড়া হবে।

### নির্বাচনে কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) অংশ নেয়

নির্বাচনে কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা অংশ নিই— প্রথমে সে সম্পর্কে আমি আমাদের দলের শিক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা ও মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কিছু বলতে চাই। যে কোনও ভাবেই হোক নির্বাচনে জিততে হবে, সিট বাড়াতে হবে এবং যার সাথে ঐক্যে গেলে সিট বাড়ানো যায় তার সাথে যেতে হবে, এই নীতিহীন সুবিধাবাদী রাজনীতির চর্চা একটা যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসাবে কখনওই আমরা করিনি। আমাদের দল পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য সামনে রেখে সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত জনগণের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে। দেশের মানুষ এটা জানে। আমরা বলি, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নির্বাচনের দ্বারা যারাই সরকারে আসুক, জনজীবনের কোনও মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়ওনি, হতেও পারে না— যা একমাত্র হতে পারে বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও শোষিত জনগণকে যতক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবের জন্য আদর্শগত, রাজনীতিগত, সংগঠনগত ও নৈতিক দিক থেকে আমরা বিপ্লবী দল হিসাবে প্রস্তুত করতে না পারছি, ততক্ষণ বুর্জোয়া ব্যবস্থায় বারবার নির্বাচন আসবে, রাজনৈতিক অসচেতন জনগণ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক নির্বাচনী জালে জড়িয়ে যাবে, ফেঁসে যাবে। এই জনগণকে নির্বাচন সম্পর্কে মোহমুক্ত করার জন্য ও জিততে পারলে বিধানসভা-লোকসভার অভ্যন্তরে শোষিত জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দাবি উত্থাপন ও প্রতিবাদ ধ্বনিত করার জন্য এবং একই সাথে বাইরে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা ভোটে লড়ি। এটাই হচ্ছে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক মহান লেনিনের শিক্ষা।

*সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। পাশে রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু*

কিন্তু সর্বহারা বিপ্লবীরা বা সংগ্রামী বামপন্থীরা কেন্দ্রে বা রাজ্যে ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে কী করবে? এই প্রশ্ন লেনিনের সময় আসেনি, ফলে তিনি এ ব্যাপারে কোনও গাইডলাইন দিয়ে যাননি। সেই গাইড লাইনই দিয়েছেন ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের প্রাক্কালে লেনিনেরই সুযোগ্য ছাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেছেন, একটি যথার্থ বামপন্থী সরকার— ১) শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনগণের ন্যায়সংগত গণআন্দোলনকে উৎসাহিত করবে, ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষার নামে অন্য বুর্জোয়া সরকারগুলির মতো পুলিশ দিয়ে সেগুলি দমন করবে না, ২) আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

# আবার বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে সরকার, প্রতিবাদে গ্রাহক বিক্ষোভ

মাশুল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দিল্লিতে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির করা তিনটি মামলা প্রত্যাহার, বিদ্যুতের মাশুল কমানো এবং কেন্দ্রীয় বাজেটে কয়লার উপর দ্বিগুণ সেস চাপানোর জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে অ্যাবেকার নেতৃত্বে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তিন সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক ৩ মার্চ কলকাতায় বিক্ষোভ দেখান। কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছালে বিশাল পুলিশবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে। বিক্ষোভকারীরা ডোরিনা ক্রসিং অবরোধ করেন। সেখানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এবং রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী মনীশ গুপ্তের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী। প্রদ্যোৎ চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে কয়লার উপর প্রতি মেট্রিক টনে সেস দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৪০০ টাকা করা হয়েছে। দেশের ৯০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কয়লানির্ভর। ফলে অবধারিত ভাবে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়বে।

*চারের পাতায় দেখুন*

# কংগ্রেসের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির চর্চাই বিজেপি - আর এস এসের শক্তিবৃদ্ধির জমি তৈরি করেছে

*একের পাতার পর*

খর্ব করে সংগঠিত সচেতন জনগণের উপর নির্ভর করে সরকার চালাবে, ৩) দুর্নীতিমুক্ত নিরপেক্ষ প্রশাসন চালাবে এবং সরকারি অর্থ জনকল্যাণমূলক খাতে এবং সবচেয়ে দরিদ্র মানুষদের স্বার্থে কাজে লাগাবে। আমাদের এই বক্তব্য, মূলত প্রথম পয়েন্টটি সেদিন সিপিএম ও অন্যান্যরা কিছুতেই মানতে চায়নি, পরে আমাদের দলের তীব্র চাপে শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়, কিন্তু কার্যকর করার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা দেয়। এই নীতির ফলেই ১৯৬৭-'৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয় এবং স্লোগান ওঠে, 'যুক্তফ্রন্ট সরকার, গণআন্দোলনের হাতিয়ার'। ১৯৭৭ সাল থেকে একটানা ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিকে তুষ্ট করার জন্য কাজ করায় স্লোগানটা উল্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল 'বামফ্রন্ট সরকার গণআন্দোলন দমনের হাতিয়ার'। দেশি-বিদেশি পুঁজিকে তুষ্ট করার সেই কাজটা এখন তৃণমূল সরকারও করছে। অন্যত্র বিজেপি এবং কংগ্রেস তো একাজ আগের থেকেই করে যাচ্ছে।

আপনারা জানেন, এ পর্যন্ত যারা কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকারে বসেছে ও সেই লক্ষ্যে ভোটে দাঁড়ায় তারা নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা প্রতিশ্রুতি দেয়। যেমন, 'গরিবি হঠাও', 'দারিদ্র দূরীকরণ', 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা', 'সুদিন', 'আচ্ছে দিন', 'পরিবর্তন', 'উন্নয়ন'— এই সব আওয়াজ তুলে মানুষকে বারবার ঠকায়। পরবর্তীকালে মানুষ খুব হতাশ হয়ে দেখে যে, প্রত্যেকেরই প্রতিশ্রুতিগুলি ভোটে ফায়দা তোলার ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়। এই দলগুলির যা শ্রেণি চরিত্র তাতে এরকম ঘটাই স্বাভাবিক।

## পার্লামেন্ট আছে, ডেমোক্রেসি নেই

আমরা এটাও মনে করি, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি একসময় রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে যে ঘোষণা নিয়ে এসেছিল, তখন তার যা ঘোষিত লক্ষ্য ছিল, অর্থাৎ বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল বা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, প্রথম দিকে যতটুকু তার চর্চা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে সেসব শুধু কথার কথা হিসাবে থেকে গেছে। বাস্তবে কোথাও তার কোনও অস্তিত্ব নেই। পার্লামেন্ট আছে, কিন্তু ডেমোক্রেসি নেই। বাস্তবে দাঁড়িয়েছে, ভোট মানে জনগণের রায় নয়—মানি পাওয়ারের রায়, শিল্পপতিদের রায়। তারাই ঠিক করে, কারা সরকারি গদিতে বসবে, কারা প্রধান বিরোধী দল হবে। যারা মন্ত্রীত্বের গদিতে বসে তারা বুর্জোয়াদের মাইনে করা সেবাদাস হিসাবে সরকার চালায়। কখনও নির্বাচনে পুনরায় নিযুক্ত হয়, কখনও তাকে সরিয়ে অন্য কাউকে বসায়। এটাই বারবার ঘটছে গোটা দুনিয়াব্যাপী। আমাদের দেশেও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই। গোড়ার দিকে মাল্টি ক্যাপিটাল বা বহু ক্ষুদ্র পুঁজিপতি ছিল, তখন তাদের বহু দল ছিল। সেই সময় বহুদলীয় গণতন্ত্র বা মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি ছিল। পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র পুঁজিকে গ্রাস করে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি এসেছে, ফলে এই যুগে আর বহুদলীয় গণতন্ত্র বাস্তবে নেই। তার জায়গায় এসেছে দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থা। এটাও মনে রাখবেন, এই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ঝান্ডা উড়িয়েই সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ দখল ও লুণ্ঠন করেছে। দু'বার বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে, সাম্প্রতিক কালে ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়ার স্বাধীনতা ধ্বংস করেছে, সিরিয়াতে আক্রমণ চালাচ্ছে। ধর্মীয় মৌলবাদকে উস্কানি দিয়ে স্থানীয় যুদ্ধ বাধাচ্ছে। এই হচ্ছে বর্তমান বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির আসল চেহারা!

আমাদের দেশে এখন খুব দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ নিয়ে শোরগোল চলছে। নানা রাজনৈতিক দল— বিশেষত দু'টি প্রধান জাতীয় বুর্জোয়া দল— বিজেপি এবং কংগ্রেস একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করছে কে কত দেশপ্রেমিক, কার জাতীয়তাবাদ কতখানি, এই নিয়ে। দেশ বলতে যদি বোঝায় নিছক মাটি-গাছপালা-নদী-পাহাড় নয়— বোঝায় দেশের মানুষ, জনগণ, তাহলে বলতে হয়, সেই জনগণের প্রতি এই দলগুলোর কি কোনও দায়বদ্ধতা-প্রেম-ভালবাসা আছে? আসলে এদের দেশপ্রেম হচ্ছে মন্ত্রীত্বের গদির প্রতি প্রেম, আর তাদের মনিব শিল্পপতিদের প্রতি, ধনকুবেরদের প্রতি প্রেম। এই প্রেমই বারবার কংগ্রেস এবং বিজেপি প্রমাণ করছে। কংগ্রেস ১৯৪৭ থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত একটানা কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় ছিল। কংগ্রেস শাসন মানে শোষক জাতীয় বুর্জোয়াদের শাসন, জোতদারদের শাসন, দেশি-বিদেশি পুঁজির অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণ। বিজেপি যেখানে যতবার ক্ষমতায় এসেছে, একই রাস্তায় চলেছে। এখনও সেই একই নীতি নিয়ে চলছে। এদের যত প্রেম কালোবাজারি-মজুতদার, আর কালো টাকার কারবারিদের জন্য। কোটি কোটি রিক্ত, নিঃস্ব, ক্ষুধার্ত জনগণের জন্য কে ভাবছে? এদের জন্য কারও কোনও কনসার্ন আছে, এতটুকু দরদ, সহানুভূতি আছে?

দেশে আজ চরম সংকট, কোটি কোটি মানুষ বেকার, অর্ধবেকার। গতবছর সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে পিওনের মাত্র ৩৬৮টি পোস্টের জন্য আবেদন করেছে ২৩ লক্ষেরও বেশি মানুষ। তার মধ্যে ২৫৫ জন ডক্টরেট, ২৫ হাজার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। একটা রাজ্যের এই চিত্র! এই মানদণ্ডে অন্য রাজ্যগুলির কথা একবার ভাবুন। এরা সব উচ্চ ডিগ্রিধারী। আর ডিগ্রিহীনদের তালিকার খবর কে রাখে! কোটি কোটি বেকার কাজের খোঁজে এখানে- সেখানে পাগলের মতো ঘুরছে, দেশে-বিদেশে ছুটছে। এই হচ্ছে দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি! গ্রামের শিক্ষাহীন মেয়েরা পর্যন্ত বাইরে বেরোচ্ছে কাজের খোঁজে যত্রতত্র। এমনকী গরিব বাবা-মা পেটের জ্বালায় মেয়েদের বিক্রি করে দিচ্ছে। অভাবী ঘরের মেয়েরা দেহ বিক্রির বাজারে পণ্য হয়ে যাচ্ছে। হাজারে হাজারে ছাঁটাই শ্রমিক, ঋণগ্রস্ত কৃষক সুইসাইড করছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৭৯৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। পরের তিন বছরে সংখ্যা আরও যোগ হয়েছে। এর সাথে আরও কয়েক লক্ষ বেকার, ছাঁটাই শ্রমিক যুক্ত করুন। খরা-বর্ষায় প্রতি বছরই কৃষি মার খাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ট্যাক্স বৃদ্ধি, পরিবহণে ভাড়া বৃদ্ধি, শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধি চলছেই। এই হচ্ছে উন্নয়ন! কোথায় হচ্ছে শিল্পোন্নয়ন? শিল্পের সংকট গোটা বিশ্বব্যাপী। বাজার অর্থনীতির কোনও বাজার নেই। বাজার মানে তো জনগণের কেনবার ক্ষমতা। তা, মানুষের যদি আয় না থাকে, কেনবার ক্ষমতা কোত্থেকে পাবে! ফলে হাজারে হাজারে শিল্প বন্ধ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই চলছে। সরকারি-বেসরকারি সব অফিসে-শিল্পে পার্মানেন্ট চাকরির নিয়োগ প্রায় বন্ধ, চুক্তিতে আর কন্ট্রাক্টরের অধীনে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ হচ্ছে। আগে কোনও শিল্পে ১০০ জন শ্রমিক থাকলে ছাঁটাই-লে অফ-ক্লোজারে সরকারি অনুমতির দরকার হত, এখন ৩০০ জন থাকলেও সরকারি অনুমতি লাগবে না। ফলে ভারতবর্ষে ৯০ শতাংশ শিল্পে মালিকরা ইচ্ছামতো ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজার করতে পারবে, এমন আইন চালু হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে। ছাঁটাইয়ের ভয়ে মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলতে পারছে না অভাবী শ্রমিকেরা। এই হচ্ছে বিজেপি-র 'মেক ইন ইন্ডিয়া'। এইভাবেই ইন্ডিয়াকে মেক করছে। এই হচ্ছে 'আচ্ছে দিন'। সরকারি হাসপাতাল সব বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে। কোথাও পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার নেই, পরিকাঠামো নেই, ওষুধ নেই, চিকিৎসা নেই। ওষুধের দাম সাংঘাতিক। আগে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের দাম সরকার যতটুকু কন্ট্রোল করত, তাও তুলে দিয়েছে। ক্যানসার সহ কতকগুলি জীবনদায়ী ওষুধের আগে ইমপোর্ট ডিউটি ছাড় ছিল, এখন তাও তুলে দিল। মানুষ বাঁচবে কী করে? চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে গিয়ে শুধু রোগী নয়, পরিবারও মৃতপ্রায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাইভেটাইজেশন চলছে। শিক্ষার ব্যয় ক্রমাগত বাড়ছেই। শিক্ষা বাজেট, স্বাস্থ্য বাজেট ক্রমাগত কমছে। বাড়াচ্ছে মিলিটারি বাজেট। অন্যদিকে যেখানে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বাজেট ঘাটতি ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৪৯ কোটি টাকা, দেশি-বিদেশি ঋণ ৬৮ লক্ষ ৯৪ হাজার কোটি টাকা, সেখানে সরকার শিল্পপতিদের ট্যাক্স মকুব করেছে ৫ লক্ষ ২ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা। ব্যাঙ্ক থেকে শিল্পপতিদের ৬ লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎ করতে দিয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২৮ লক্ষ কোটি কালো টাকা দেশে জমছে। পশ্চিমবঙ্গে ও বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক ঋণ রেখে গেছে, তৃণমূল শাসনে এই ঋণ বাড়তে বাড়তে ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার কোটি টাকা হতে চলেছে। ফলে এ রাজ্যে সরকারকে প্রতি বছর সুদই দিতে হবে ৩০,০০০ কোটি টাকা। এই সবই পাবলিকের টাকা। ফলে ট্যাক্স আরও বাড়বে, জিনিসপত্রের দামও আরও বাড়বে। এদের দেশপ্রেম বলতে এগুলোই বোঝায়।

## আরএসএস স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল

আরএসএস কোনও দিনই স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল না। ভারতে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভিত্তি করে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল, তাকে আরএসএস নেতা গোলওয়ালকর প্রতিক্রিয়াশীল বলেছেন, সমর্থন করেননি, যেহেতু স্বাধীনতা আন্দোলন খোলাখুলি হিন্দু ধর্মভিত্তিক ছিল না।[১] এর অর্থ দাঁড়ায়, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র এবং লালা লাজপত, তিলক, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম এঁরা কেউ দেশপ্রেমিক ছিলেন না। আর এস এস নেতারা কোথায় ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে? কখনও কোনও দিন জেলে গেছেন, কোনও দিন মার খেয়েছেন? এই যাঁদের ইতিহাস, আজ তাঁরা দেশপ্রেম নিয়ে কথা বলছেন!

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদটা এসেছিল ইউরোপের রেনেসাঁসের যুগে, ধর্মভিত্তিক রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। রাজনৈতিক দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। রাষ্ট্র কোনও ধর্মকে যেমন উৎসাহ দেবে না, ধর্ম চর্চায় হস্তক্ষেপও করবে না। ধর্ম ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাস হিসাবে থাকবে। কেউ মানবে, কেউ মানবে না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীবাদী নেতৃত্ব এ জিনিসের চর্চা করেনি। জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থে বিপ্লববিরোধী আপসকামী কংগ্রেস নেতৃত্ব ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চর্চা করেছে, তা-ও ছিল মূলত উচ্চ বর্ণের হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের বিরাট অংশের মুসলিম জনগণকে টানা যায়নি। এমনকী তথাকথিত নিম্নবর্ণের জনগণও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এরই পরিণতিতে দেশ বিভাজন হল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র ছিলেন এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। তিনি যথার্থ সেকুলার হিসাবে বলেছিলেন, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসাবে থাকবে। রাজনীতি চলবে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা।[২] তিনি হিন্দু মহাসভাকে সমালোচনা করে বলেছিলেন, এই গেরুয়াধারী যারা কমণ্ডলু নিয়ে ভোট ভিক্ষা করছে, এদের দেশের শত্রু হিসাবে গণ্য করা উচিত।[৩] শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত মানবতাবাদের চর্চা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলও রাজনীতির সাথে ধর্মকে যুক্ত করার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব শুরু থেকেই বিপরীত পথে চলেছে, ফলে কংগ্রেস কোনও দিনই সেকুলার ছিল না।

## স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চর্চা হয়েছে

আরএসএস-বিজেপি যে এতখানি হিন্দুধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ঝান্ডা তুলে দাঁড়াতে পারল, তারও প্রধান কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চর্চা। পরে স্বাধীন ভারতে সুদীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে কতবার গণআন্দোলনের ঐক্য ভাঙার ষড়যন্ত্রে এবং ভোটব্যাঙ্ক তৈরির হীন উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো হয়েছে। সর্বশেষ কংগ্রেস করেছে দিল্লির শিখনিধন দাঙ্গা। এই কংগ্রেসকেই সিপিএম সেক্যুলার আখ্যা দিচ্ছে। আর বিজেপিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়েই শক্তি বাড়িয়েছে। ওরা নিজেদের বিবেকানন্দের শিষ্য বলে দাবি করে। অথচ বিবেকানন্দ বলেছেন, "খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না, মুসলমানকে হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিস্টান হতে হবে না। ...আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানেই নিয়ে যেতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই, অথচ সেকাজ করতে হবে বেদ, বাইবেল ও কোরানকে সমন্বয় করেই।"[৪] তিনি বলেছেন, "রাম ও কৃষ্ণ অযোধ্যায় ও মথুরায় জন্মেছে কি না, এটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী, এইসব চরিত্র কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক, এটাও ভাবার দরকার নেই। দরকার হচ্ছে রামায়ণ, মহাভারত থেকে সুশিক্ষা নেওয়া।"[৪ক]

যে বিজেপি ভোটের স্বার্থে রামরথ চালাল, ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভাঙল, বারবার দাঙ্গার আগুন জ্বালাল, তারা যথার্থ হিন্দু, না বিবেকানন্দ যথার্থ হিন্দু ছিলেন? তিনি এ কথাও বলেছিলেন, ক্ষুধার্ত

*তিনের পাতায় দেখুন*

---

(১)ঃ "ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং সাধারণ বিপদের তত্ত্বকে ভিত্তি করে আমাদের যে জাতিতত্ত্ব গঠিত হয়েছে, সেটা কার্যত আমাদের হিন্দু জাতিতত্ত্বের সদর্থক প্রেরণা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করেছে। ব্রিটিশের প্রতি বিরোধিতার সাথে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করা হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের ওপর সর্বনাশা প্রভাব ফেলেছে।" (উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড)

(২)ঃ ক্রসরোডস্ — সুভাষচন্দ্র বসু

(৩)ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা — ১৪ মে, ১৯৪০

(৪) ও (৪ক)ঃ বাণী ও রচনা — বিবেকানন্দ

# হিটলারকে পথপ্রদর্শক বলে অভিনন্দন জানিয়েছিল আর এস এস

*দুয়ের পাতার পর*

মানুষকে ধর্ম নয়, রুটি দাও। বিজেপি কি তাই করছে? এটাও অনেকে জানেন না, বাবরি মসজিদের তালা খুলে প্রথম রামপুজা কংগ্রেসের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীই শুরু করিয়েছিলেন হিন্দু ভোট টানার জন্য। আর বিজেপি এসে মসজিদটাকেই ভেঙে দিল পুরোপুরি হিন্দুদের ভোট টানার জন্য। তখন নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বে কংগ্রেসের সরকার বাধা দেয়নি। এদের কারও মধ্যেই কোনও ধর্ম নেই, আছে শুধুমাত্র ভোটের স্বার্থ।

আর এখন তো দেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক সব বুর্জোয়া পার্টিই হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক, মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক, জাতভিত্তিক ভোট ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিকতাভিত্তিক ভোট ব্যাঙ্ক— এই রাজনীতিই করছে গদি দখলের স্বার্থে।

আমাদের দেশে কংগ্রেস পুঁজিবাদের স্বার্থে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যাকে মজবুত করছে আজ বিজেপি। এটা আমরা অতীতেও বারবার বলেছি, এই নির্বাচনের সামনে আবার বলতে চাই। ফ্যাসিবাদের ভয়ঙ্কর আক্রমণ মানে যুক্তিবাদী মনন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা, প্রশ্ন করার, তর্ক করার মানসিকতা ধ্বংস করে অন্ধবিশ্বাস জাগানো, ধর্মান্ধতা জাগানো। কংগ্রেস একাজ শুরু করেছিল। বিজেপি হিন্দুত্বের জিগির তুলে এটাকে আরও ব্যাপকভাবে করছে।

কংগ্রেস আমলে রাজীব গান্ধী নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করেছিল— যেটা ছিল ধর্মভিত্তিক শিক্ষা। আর বিজেপি তো আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বৈদিক শিক্ষা চালু করছে, ইতিহাসকে বিকৃত করছে, প্রাচীন ভারতের হিন্দুত্বের গৌরব দেখাতে সত্যকে বিকৃত করছে। গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন থেকে শুরু করে হাইজেনবার্গ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্ল রায়, সি ভি রমন, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যত কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন, সবই নাকি অতীতে প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিরা করে গেছেন— এই রকম উদ্ভট প্রচার করছে।

এর উদ্দেশ্যটা কী? আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ করা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধ্বংস করা, যুক্তিবাদী মননকে ধ্বংস করা। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ হচ্ছে গোটা দেশে। মনে রাখবেন, যে ফ্যাসিস্ট হিটলারকে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিশ্বের সকল মনীষীরা মানবজাতির শত্রু গণ্য করেছিলেন, আরএসএস-এর গুরু গোলওয়ালকর সেই হিটলারকে পথপ্রদর্শক বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।[৫]

### তৃণমূল সরকার বাস্তবে দাঁড়িয়েছে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারেরই কার্বন কপি

আর একটা আক্রমণ হচ্ছে, মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে দাও। মানুষের মূল্যবোধ নষ্ট করে দাও। মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিহীন রোবট করে দাও। চেহারায় মানুষ, কিন্তু নীতি-সংস্কৃতি কিছু থাকবে না, অর্থাৎ মনুষ্যত্বহীন মানুষ তৈরি হচ্ছে। বিশেষত ছাত্র-যুব সমাজকে এদিকে ঠেলে দাও। ফলে পারিবারিক জীবন ধ্বংস হচ্ছে, সামাজিক জীবন ধ্বংস করা হচ্ছে। স্নেহ- মায়া- মমতা- দয়া— যেগুলো মানুষের জীবনে মূল্যবান সম্পদ, গোটা দেশে ধ্বংস হচ্ছে। এটাও ফ্যাসিবাদের একটা আক্রমণ। মানুষ হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে গোটা দেশে ধ্বংস করা হচ্ছে। এই তো অবস্থা। অন্যদিকে যে 'পরিবর্তনে'র কথা বলে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় বসেছে, সেখানে পরিবর্তন বলতে ঘটেছে বামফ্রন্টের বদলে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসেছে। বাকি আর কিছু হয়নি। বাস্তবে তৃণমূল সরকার দাঁড়িয়েছে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারেরই কার্বন কপি। আগের মতোই গণআন্দোলনে পুলিশি জুলুম চলছে, আমাদের দলের দু'জন আন্দোলনকারীর চোখ লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ওরা নষ্ট করেছে। তৃণমূল রাজত্বে আগের মতোই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধি, স্তরে স্তরে ঘুষ ও দুর্নীতির রাজত্ব, তোলাবাজি, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন অবাধে চলছেই। পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিচালনা সর্বক্ষেত্রেই একচ্ছত্র দলতন্ত্র চলছে বামফ্রন্টের দেখানো পথে। আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল হিসাবে তৃণমূল সরকার যে এইভাবেই চলবে, এটা আমরা ওদের সাথে যখন ঐক্যে ছিলাম, তখনই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম।

এই অবস্থায় যেখানে প্রয়োজন ছিল উন্নত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আধারে সমগ্র ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে একটা শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলা, সেখানে সিপিএম নেতারা ভোটের সুবিধাবাদী স্বার্থে জাতীয় বুর্জোয়া দল কংগ্রেসের সাথে ঐক্যে চলে গেলেন। এই প্রজন্মের অনেকেই জানেন না, ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনে অবিভক্ত সিপিআইকে আমাদের দলের প্রস্তাব মতোই একদিন যুক্ত করা হয়েছিল। তখন আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক অনেক শক্তিশালী দল ছিল। সিপিআই ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন ও নেতাজির বিরুদ্ধতা করার জন্য তারা প্রথমদিকে এটা চায়নি। ১৯৫০ সালের কথা বলছি। আপনারা জানেন, অবিভক্ত বাংলা ছিল ভারতবর্ষের বিপ্লববাদের উৎসস্থল। ক্ষুদিরাম দিয়ে এর সূচনা হয়েছিল। এই বিপ্লববাদের প্রতিনিধি ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র, তা নিয়েই বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্য। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী এই দু'টি শব্দ তখন থেকেই এসেছে। তখন বলা হত, গান্ধীজি দক্ষিণপন্থী, সুভাষচন্দ্র বামপন্থী। এর সাথে যুক্ত হল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, চীন বিপ্লবের প্রভাব। এ নিয়ে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব খুব বেড়েছিল। তারা এবং আমরা ও অন্য বামপন্থী দলগুলো পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকে একসঙ্গে বহু আন্দোলন করেছি। পশ্চিমবাংলা তখন ছিল গণআন্দোলনে উত্তাল। গোটা ভারতবর্ষ তখন বাংলার দিকে তাকিয়ে থাকত। এখান থেকেই ভারতে নবজাগরণের সূচনা, স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লববাদের সূচনা। প্রথমদিকে এটাই ছিল মূলত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের সাধনার কেন্দ্রস্থল। হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো (আজ বাংলা যা ভাবে, কাল ভারত তা ভাববে) — স্বদেশি আন্দোলনে গোখলের সেই বিখ্যাত উক্তি এখনকার অনেকেই জানেন না। বামপন্থী আন্দোলনেও পশ্চিমবাংলাই কেন্দ্রস্থল ছিল, তা বাঙালি হিসাবে বা অন্য কোনও কৃতিত্বের জন্য নয়, যেহেতু কলকাতা ছিল ব্রিটিশ সরকারের রাজধানী, আর এখানেই ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো প্রথম পৌঁছেছিল, তার প্রভাবেই এসব ঘটেছিল।

অতীতে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনের দিনগুলিতে আমরা মার্কসবাদী দল হিসাবে বিপ্লবী লাইন নিয়ে এবং যেহেতু সিপিআই ও সিপিএম যথার্থ মার্কসবাদী ছিল না, তারা ভোটসর্বস্ব সংস্কারবাদী লাইন নিয়ে চলার ফলে আমাদের উভয়ের মতবাদিক দ্বন্দ্বও ছিল। কিন্তু তখনও তারা তাদের সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও সংগ্রামী বামপন্থী চরিত্র নিয়ে ছিল। ফলে আমাদের সাথে তাদের ঐক্য ছিল, আবার মতপার্থক্যও ছিল। এটাও আপনাদের জানা দরকার, পাঁচ ও ছয়ের দশকে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ সিপিআই, সিপিএমের আন্দোলনে ঐক্য হলেও নীতিগত পার্থক্যের জন্য ১৯৫২ সালে, ১৯৫৭ সালে, ১৯৬২ সালে নির্বাচনে ওদের সাথে আমাদের ঐক্য হয়নি। আমরা আলাদা লড়েছি। এগুলো অতীত ইতিহাস। আমরা একত্রে দুটো সরকারও করেছি ১৯৬৭-'৬৯ সালে। আমাদের সাথে ঐক্য তারাই ছিন্ন করে '৭৪ সালে। উত্তর ও পূর্ব ভারতে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন যখন হয়, সিপিএম আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল সেই সময়।[৬] আমরা বলেছিলাম, আমরা বামপন্থীরাই যুক্তভাবে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেব, না হলে দক্ষিণপন্থীরা মানে জনসংঘ আন্দোলনকে বিপথগামী করবে। এটা একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু তখন সিপিআই প্রকাশ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসকে সমর্থন করছিল। আর সিপিএম তলে তলে কংগ্রেসের সাথে বোঝাপড়ায় ছিল, ফলে তারা ওই আন্দোলনে এল না দক্ষিণপন্থীরা আছে এই অজুহাতে। আমরা তাদের সমালোচনা করেছিলাম। এইজন্য সিপিএম আমাদের সাথে ঐক্য ভাঙে। যে সিপিএম দক্ষিণপন্থীরা আছে বলে জয়প্রকাশের মুভমেন্টে গেল না, '৭৭ সালে সেই সিপিএমই কিন্তু যে জনতা পার্টির মধ্যে জনসংঘ ছিল তার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়ল। অথচ জয়প্রকাশের মুভমেন্টে যদি সিপিএম সহ আমরা বামপন্থীরা থাকতাম, তাহলে বিজেপি-র এই উত্থান ঘটতে পারত না। '৭৭-এর নির্বাচনে আমরা আলাদা লড়াই করি। সিপিএম বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে। '৭৭ থেকে টানা ৩৪ বছরের শাসনকে আমরা বলেছি, এটা বামপন্থার রাস্তায় চলছে না। যে কোনও একটা বুর্জোয়া সরকারের মতোই বামফ্রন্ট সরকার কাজ করছে— যার বিরুদ্ধে জনগণের দাবি নিয়ে বারবার আমরা গণআন্দোলন করেছি এই ৩৪ বছর। আপনারা জানেন, বহু আন্দোলন আমরা করেছি। আমাদের আন্দোলনের চাপে প্রাথমিকে ইংরেজি চালু হয়। এটা সকলে জানেন। অন্যান্য বহু দাবিও আমরা আদায় করেছি। ওদের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সমর্থনে ন'বার বাংলা বনধ করেছি। সিপিএম আমলে আমাদের ১৬১ জন কর্মী খুন হন। আমাদের ৪৯ জন কর্মীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ফলে। কিন্তু তখনও আমরা বলেছি, সর্বভারতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বামপন্থী ঐক্য হোক, অন্যান্য রাজ্যেও ঐক্য হোক। সিপিএম নেতৃত্ব বললেন— 'না, পশ্চিমবঙ্গে আপনারা আগে আন্দোলন থামান, তা হলে ঐক্য হবে'। ফলে তারাই সেদিন আমাদের সাথে ঐক্য চায়নি, কিন্তু আমরা ঐক্য চেয়েছিলাম। কিছুদিন আগে সেই ঐক্যের আহ্বান নিয়ে সিপিএমের পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট এলেন আমাদের সাথে বৈঠক করতে। ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনের স্বার্থে আমরা রাজি হলাম। ৬ পার্টির ঐক্য হল, আপনারা জানেন। আমরা তাদের বলি, কেরালায় আমাদের আলাদা একটা বামফ্রন্ট আছে, সেখানে ৬ পার্টির মোর্চা হবে না। আর বললাম, পশ্চিমবাংলায় দু'টি ইস্যুতে এখন আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করব— সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। বললাম, আপনাদের সাথে অতীতের তিক্ততার যত অবসান হবে, বোঝাপড়া যত উন্নত হতে থাকবে, ঐক্যও তত সম্প্রসারিত হবে। এটা নিয়েই আমরা চলছিলাম। আমরা এ-ও বলেছিলাম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় আমাদের শতাধিক কর্মী বামফ্রন্ট আমলে খুন হয়েছেন, বহু কর্মী সেই সময় থেকে এখনও কারারুদ্ধ হয়ে আছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে আন্দোলনের রক্তাক্ত অধ্যায় রচিত হয়েছিল। এই অবস্থায় আগামী নির্বাচনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুর বাদে বাকি পশ্চিমবাংলায় আমরা নির্বাচনে আপনাদের সাথে বোঝাপড়া করতে পারি। এটা তাঁদের কাছে আমাদের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু তাঁরা আমাদের সাথে নির্বাচন নিয়ে কোনও আলোচনায় এলেন না। আমরা কাগজে দেখছি, তাঁরা কংগ্রেসের সাথে ঐক্যে যাচ্ছেন। আমরা মনে করি, এটা বামপন্থী আন্দোলনের উপর একটা বিরাট আঘাত হিসাবে এল।

### গণআন্দোলন দমনে কংগ্রেস রেকর্ড করেছে

ওরা বলছেন, কংগ্রেস গণতান্ত্রিক শক্তি। কংগ্রেস কি গণতান্ত্রিক শক্তি? এত বছর ধরে কেন্দ্রে কংগ্রেস শাসন করল, সেটা কি গণতান্ত্রিক শাসন ছিল? জরুরি অবস্থার কথা সকলেই জানেন। তাছাড়াও কংগ্রেস পরপর এসমা, মিসা, টাডা ইত্যাদি আইন চালু করে, আন-ল-ফুল অ্যাক্টিভিটি প্রিভেনশন আইন চালু করে —যাতে বিনা বিচারে ১৮০ দিন জেলে রাখা যায়। আফস্পা আইন চালু করেছে— যে আইন অনুযায়ী মিলিটারি যে কোনও অজুহাতে কাউকে খুন করলে বা নারী ধর্ষণ করলেও আদালতে তার বিচার হবে না। এই আইন কংগ্রেস চালু করে— যা কাশ্মীরে, মণিপুরে, আসামে প্রয়োগ চলছে। এগুলি কি গণতান্ত্রিক আইন? ভারতবর্ষে কত রাজ্যে গণআন্দোলন দমনে কংগ্রেস লাঠিগুলি চালিয়ে কত খুন করেছে। স্মরণ করুন, সেই পাঁচের দশকে ট্রামভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন কীভাবে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার দমন করেছে। '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে, '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে কত রক্ত ঝরেছিল, কত শহিদ হয়েছিল। আজও সিপিএম নেতারা '৫৯ সালের শহিদদের স্মরণে ৩১ শে আগস্ট পালন করেন। আমরা তো করিই। সেই কংগ্রেস আজ ওদের চোখে হয়ে গেল গণতান্ত্রিক শক্তি!

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

(৫) ঃ "জার্মানির জাতীয় গৌরববোধ আজকের দিনের আলোচ্য বিষয় হয়েছে। নিজস্ব জাতির ও সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য সেমেটিক জাতি ইহুদিদের বিতাড়ন করে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জাতীয় গর্ববোধ এখানে সবচেয়ে প্রতিভাত হয়েছে। জার্মানি দেখিয়ে দিয়েছে, কেন বিভিন্ন ধরনের জাতি ও সংস্কৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, যার থেকে আমরা হিন্দুস্তানিরা শিখতে ও লাভবান হতে পারি"। (উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড)

(৬) ঃ ১৯৭৩-৭৪ সালে ব্যাপক গণআন্দোলন গুজরাট থেকে শুরু হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল কেন্দ্রের ইন্দিরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়প্রকাশ নারায়ণ। বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র রক্ষা ইত্যাদি ছিল ওই আন্দোলনের মূল ইস্যু। দলে দলে ছাত্র-যুবরা এগিয়ে এসেছিল। বামপন্থীদের অনুপস্থিতির ফলে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলি, বিশেষত জনসংঘ (পরে বিজেপি), আর এস এস ওই আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। ওদের প্রভাব আটকাবার ও বামপন্থীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য থেকেই সিপিআই, সিপিএম নেতৃত্বকে আহ্বান জানিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)।

# নিয়োগ বন্ধের প্রতিবাদে কলকাতায় নার্সদের মিছিল

*দীর্ঘ বছর ধরে বি এস সি নার্সিং ট্রেনিংপ্রাপ্তদের নিয়োগ বন্ধ রাখার প্রতিবাদে এবং বি এস সি নার্সদের নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগের দাবিতে ১ মার্চ নার্সেস ইউনিটির নেতৃত্বে নার্সদের মিছিল হয় এন আর এস মেডিকেল কলেজ থেকে। পরে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়।*

## ত্রিপুরায় ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

৩ মার্চ রামঠাকুর কলেজের এক ছাত্রের পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর সিপিএম সরকারের পুলিশ বাহিনী যে লাঠি চার্জ করে তার প্রতিবাদে ৫ মার্চ এ আই ডি এস ও রামঠাকুর কলেজ কমিটি বাধারঘাট চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ সভায় দাবি করা হয় ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ চলবে না, আহত ছাত্রদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, ছাত্রদের উপর আক্রমণকারী পুলিশদের শাস্তি দিতে হবে, বাধারঘাট চৌমুহনীতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন ডি এস ও-র আগরতলা জেলা সম্পাদক কমরেড রামপ্রসাদ আচার্য।

## পুরুলিয়ায় ধাত্রীদের ডি এম দপ্তর অভিযান

**সমস্ত ধাত্রীদের (ধাইমা) পরিচয়পত্র প্রদান, সরকারিভাবে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা, ন্যূনতম ৬০০০ টাকা ভাতা, সকলকে বিপিএল তালিকাভুক্ত করা ইত্যাদি সাত দফা দাবিতে ২৯ ফেব্রুয়ারি ডি এম দপ্তর অভিযানের কর্মসূচি নেয় পুরুলিয়া জেলা ধাত্রী বাঁচাও কমিটি। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় দুই সহস্রাধিক ধাত্রী পুরুলিয়া শহরে মিছিল করে ডি এম দপ্তরের সামনে উপস্থিত হন। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ সভা চলতে থাকে। সমস্ত ধাত্রী ডি এম গেটের সামনে প্রখর রোদের মধ্যেই বসে পড়েন। এক প্রতিনিধি দল ডি এম-এর কাছে ডেপুটেশন দেয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন পুরুলিয়া জেলা ধাত্রী বাঁচাও কমিটির সভানেত্রী সুস্মিতা মাহাত এবং কমিটির উপদেষ্টা রঙ্গলাল কুমার।**

## গ্রাহক বিক্ষোভ

*একের পাতার পর*

সরকার নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি দিল্লিতে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে তিন দফায় মাশুল বাড়ানোর জন্য মামলা করেছে। এই মামলায় তারা জিতলে প্রতি ইউনিটে মাশুল দাঁড়াবে ১৩ টাকা। অ্যাবেকার দাবি সরকারকে এই মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অ্যাবেকাই একমাত্র সংগঠন যারা দিল্লিতে এই আইনি লড়াইতেও অংশ নিয়ে এর বিরোধিতা করেছে।

*৩ মার্চ জলপাইগুড়ির মাল মহকুমায় অ্যাবেকার মিছিল*

সভার সভাপতি কুণাল বিশ্বাস বলেন, রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী গত বছর বিধানসভায় বলেছিলেন, আমরা বিদ্যুতের দাম বাড়াইনি বরং কমিয়েছি। অথচ গত পাঁচ বছরে ১২ দফায় ২৩০ পয়সা বাড়িয়ে ২/১ পয়সা কমানোর নাটক করেছিলেন। তিনি এখন কী বলবেন? বিদ্যুৎ উন্নয়ন দপ্তরে স্মারকলিপি দেয় সহ সভাপতি অনুকূল ভদ্রের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল।

৩ মার্চ জলপাইগুড়ি জেলার মাল মহকুমায় ডিভিশনাল ম্যানেজারের দপ্তরে বিক্ষোভে কালিম্পং মহকুমার নেপালি ভাষাভাষী বিদ্যুৎ গ্রাহকরা অংশ নেন। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন অমল রায়, শিক্ষক এল এম শর্মা এবং শঙ্কর পাল। ঐ দিনই কোচবিহারে ডিভিশনাল ম্যানেজারের অফিসে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন কোচবিহার জেলা সম্পাদক কাজল চক্রবর্তী, অবনীভূষণ রায়, আব্দুর রউফ আমেদ প্রমুখ। ৪ মার্চ শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন দার্জিলিং জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল।

## ‘এই সময়’ পত্রিকার সংবাদের প্রতিবাদে বিধায়ক তরুণকান্তি নস্করের চিঠি

৫/৩/১৬ তারিখে ‘নাবালক পরিচারিকার রহস্যমৃত্যু’ শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিবাদ পত্র। প্রত্যাশা করব এই পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

ইয়াসমিনা গাজি নামে ১৪-১৫ বছরের একটি মেয়ে জয়নগর-মজিলপুর স্টেশনের কাছে নূরজামাল মণ্ডল নামে এক হাজির বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত। গত ৩ মার্চ সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয় এবং মেয়েটির মৃতদেহ কবরস্থ করার জন্য ৪ মার্চ ভোরে তার গ্রামের বাড়ি বাইশহাটায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাচক্রে নূরজামালের বাড়িও বাইশহাটায়। মুসলিম ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় মসজিদে ঘোষণা করা হয়— কোথাও ও কখন কবর (মাটি) দেওয়া হবে। ঘোষণা মতো গ্রামবাসীরা উপস্থিত হয়ে দেখেন তার গলায় ও গায়ে নানা ক্ষতচিহ্ন। তাতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর লক্ষণ স্পষ্ট। আমাদের দলের কর্মীরা প্রতিবাদ করে কবর দেওয়ায় বাধা দেন ও পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ প্রথমে অসহযোগিতা করে, পরে চাপাচাপিতে ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশের সামনে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত, দোষী ব্যক্তির শাস্তি ও পোস্টমর্টেমের দাবিতে আমাদের কর্মীদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ হয়। পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সকলের চাপে পুলিশ নূরজামালকেও আটক করে নিয়ে যায়। জয়নগর থানায় মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস-এর নেতৃত্বেও গতকাল (৪ মার্চ) একই দাবিতে বিক্ষোভ হয়। বিধায়ক হিসাবে আমি জয়নগর থানার ওসি এবং বারুইপুরের এস ডি পি ও-কে ফোনে একই দাবি করি। এই সমস্ত কথা ‘এই সময়’-এর স্থানীয় সাংবাদিককে আমি জানাই। জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভা অঞ্চলে এই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলও হয়।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম আপনাদের সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। মৃতদেহের পোস্টমর্টেম ও নূরজামালের আটকের পিছনে আমাদের দল ও বিধায়ক হিসাবে যে আমার কোনও ভূমিকা আছে তার কোনও উল্লেখ নেই শুধু নয়, নূরজামালকে আমাদের সক্রিয় কর্মী দেখানো হয়েছে এবং ‘এস ইউ সি কর্মীরা মিলে দেহটি কবর দেওয়ার চেষ্টা করছিল’ বলে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মহিলা সংগঠনটি যখন থানায় ডেপুটেশন দিচ্ছিল তখন উক্ত স্থানীয় সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং মেমোরান্ডামের কপিও তাঁকে দেওয়া হয়। তারও উল্লেখ তিনি করেননি। ফলে এই সংবাদটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

## এস ইউ সি আই (সি)-র দ্বিতীয় দফা প্রার্থী তালিকা

| কেন্দ্রের নাম | প্রার্থীর নাম |
|---|---|
| **হুগলি** | |
| ১৬৩। চণ্ডীতলা | দীনবন্ধু দত্ত |
| ১৬৪। চন্দননগর | রাজেশ সাউ |
| **উত্তর ২৪ পরগণা** | |
| ১৬৫। বিধাননগর | প্রফুল্ল হোড় |
| ১৬৬। বনগাঁ উত্তর | শ্যামসুন্দর হালদার |
| ১৬৭। দেগঙ্গা | অজয় সাধুখাঁ |
| ১৬৮। বারাসত | বিপ্লব দত্ত |
| ১৬৯। সন্দেশখালি | রমেশ মুণ্ডা |
| **পূর্ব মেদিনীপুর** | |
| ১৭০। নন্দকুমার | সৌমিত্র পট্টনায়ক |
| ১৭১। রামনগর | মনিকা আদক |
| **পশ্চিম মেদিনীপুর** | |
| ১৭২। পিংলা | রঞ্জিত বাঁকুড়া |
| ১৭৩। ডেবরা | দীপংকর মাইতি |
| ১৭৪। গোপীবল্লভপুর | ধর্মপাল বিশুই |
| ১৭৫। গড়বেতা | তাপস মিশ্র |
| ১৭৬। চন্দ্রকোণা | তনুশ্রী দোলুই |
| **মালদা** | |
| ১৭৭। হরিশ্চন্দ্রপুর | মোসারফ হোসেন |
| ১৭৮। হবিবপুর | শিবানন্দ সোরেন |

| কেন্দ্রের নাম | প্রার্থীর নাম |
|---|---|
| **হাওড়া** | |
| ১৭৯। উলুবেড়িয়া পূর্ব | সুখেন মণ্ডল |
| ১৮০। হাওড়া মধ্য | পরে জানানো হবে |
| ১৮১। আমতা | পরে জানানো হবে |
| **বর্ধমান** | |
| ১৮২। মঙ্গলকোট | রসিক সোরেন |
| **কলকাতা** | |
| ১৮৩। চৌরঙ্গী | কার্তিক রায় |
| ১৮৪। মানিকতলা | ডাঃ বিজ্ঞান বেরা |

**এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের**

**টর্চ চিহ্নে ভোট দিন**

# উদার অর্থনীতির মনমোহন-মোদি ম্যাজিক তা হলে উধাও!

কেন্দ্রীয় বাজেট গ্রামমুখী, কৃষিমুখী এবং মোটেই সংস্কারমুখী নয়— এই বলে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে যেন হা-হুতাশ শুরু হয়ে গেছে। কিছু বিশেষজ্ঞ এই বাজেটকে এমনকী বামপন্থী থেকে সমাজতান্ত্রিক পর্যন্ত বলে ফেলেছেন। কোনও কোনও সংবাদমাধ্যম এমন কথাও বলছে— মনমোহন সিংহের দেখানো আর্থিক সংস্কারের কড়া দাওয়াইয়ের পথ ছেড়ে এই বাজেটে জনগণকে খুশি করার জনমোহিনী পথ নেওয়া হয়েছে।

এই পর্যন্ত শুনে মনে হতে পারে, একচেটিয়া কর্পোরেট মালিকদের প্রিয় মোদিজি তাদের ত্যাগ করে শ্রমিক-কৃষকের হাত ধরেছেন। সংবাদমাধ্যমের কথায় পুরোপুরি ভরসা রাখলে অন্তত তেমনই মনে হওয়ার কথা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এখনও পর্যন্ত বণিকদের নানা সংগঠন বাজেটের বিষয়ে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তাতে মোটের উপর খুশির ঝলকই পাওয়া গেছে। শেয়ার বাজারের সূচক সেনসেক্স-এর উর্ধ্বগতিও ইঙ্গিত দিচ্ছে বণিকমহলে খুশির আবহাওয়াই চলছে। এই লক্ষণগুলি থেকে বোঝা যায় বাজেটে আর যাই হোক না কেন বণিকমহলের অপছন্দের কোনও কিছু করা হয়নি। কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব যে, শ্রমিক-কৃষকের পক্ষের বাজেট দেখে বণিকমহল খুশি হচ্ছে! তাহলে কি নরেন্দ্র মোদি-অরুণ জেটলি জুটি তাঁদের ক্ষমতায় বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খাইয়ে ছাড়লেন! বাস্তবটা আসলে কী!

১৯৯০-৯১ সাল থেকে সব সরকারই বলেছে উদারিকরণের পথে আর্থিক সংস্কারের মধ্য দিয়েই দেশের মানুষর উন্নতি সম্ভব। কোটি কোটি বেকারের কর্মসংস্থান এই পথেই হবে। এই নীতিতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি বিপুল মুনাফা করলেও ধীরে ধীরে তার ফল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচের তলায় নামবে (ট্রিকল ডাউন থিয়োরি), তাতেই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিশ্বের প্রথম ১০০ জন ধনীর তালিকায় বেশ কয়েকজন ভারতীয় স্থান করে নিলেও দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এমন নিচে নেমেছে যে, অভ্যন্তরীণ বাজার বলতে কিছুই নেই। সাম্প্রতিক 'সোসিও ইকনমিক কাস্ট সেন্সাস' অনুসারে ভারতের গ্রামীণ জনগণের ৫০ শতাংশ পরিবার অনিয়মিত কায়িক শ্রমের ভিত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করে। ৭৫ শতাংশের পারিবারিক আয় মাসে ৫০০০ টাকার কম। শহরের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষের পারিবারিক আয় ওই ৫ হাজার টাকাই। এই পরিস্থিতিতে বুক ফুলিয়ে মানুষকে সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদির মতো গলার জোরে নিজ কুকর্মের সাফাই গেয়ে বেড়ানো প্রশাসককেও ঢোক গিলতে হয়েছে। তাই গ্রামীণ উন্নয়নে বাড়তি টাকার সংস্থান, ১০০ দিনের কাজের প্রত্যাবর্তন এই সমস্ত বিষয়ের অবতারণা অরুণ জেটলিকে করতে হয়েছে। তাতেই বৃহৎ সংবাদমাধ্যম আওয়াজ তুলেছে জেটলি সংস্কারের পথ ছেড়ে নাকি 'বামপন্থী' হয়ে গেছেন। যদিও যে সব 'বামপন্থী'রা নানা সময়ে একাধিক রাজ্যে আর কেন্দ্রে মিলিজুলি সরকারের সুবাদে মসনদের স্বাদ ভোগ করেছেন, তাঁরা পার্লামেন্টে সংস্কারের বিপক্ষে মাঝে মাঝে গলা ফাটিয়েছেন আর ক্ষমতায় বসেই 'এই পথেই উন্নয়ন হবে', 'সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে', 'উদারিকরণের ভাল দিককে রাজ্যে কাজে লাগাতে হবে', এই সব যুক্তি তুলে দেশি-বিদেশি মালিকদের স্বার্থে সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক সংস্কারের স্টিম রোলারই চালিয়েছেন। কিন্তু মোদি-জেটলি সাহেবরা হঠাৎ এমন গরিব দরদি হয়ে উঠে আর্থিক সংস্কারের পথ ছেড়ে দিয়েছেন ভাবলে ভুল হবে। আসলে আর্থিক সংস্কারের ম্যাজিসিয়ানরা বুঝে গেছেন তাঁদের আলখাল্লার জেল্লায় মানুষকে আর ভোলানো যাচ্ছে না।

বাজেটের কয়েক মাস আগে থেকে সরকার দাবি করছিল দুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির নাম ভারত। তাদের হিসাবে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ৭.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। ফলে অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে। যদিও সাধারণ মানুষের জীবনে এই অগ্রগতির কোনও প্রতিফলন দেখতে পাওয়া দূরে থাক মানুষ প্রতিদিন জীবন দিয়ে অনুভব করছে তাদের সংকট কমার বদলে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। একইভাবে সরকারি হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি কমছে, কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। ফলে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারছে তাদের প্রতারণা করছে সরকার। এই ক্ষোভের

## বাজেট

আঁচেই যে বিহারে এবং দেশের নানা জায়গায় ভোটে তাদের হাত পুড়েছে তা বুঝেই নরেন্দ্র মোদি-অরুণ জেটলিরা বাজেটে গরিব দরদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন।

সত্যিই কি জনকল্যাণে মন দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার? তাহলে জনকল্যাণমুলক খাতে সরকারি খরচের পরিমাণ কমেছে কেন? কংগ্রেস আমলে কমতে কমতে ২০০৯-১০ সালে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল জিডিপির ১৫.৯ শতাংশ, এ বছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ হয়েছে জিডিপির ১২.৬ শতাংশ। এই সরকারি ব্যয়ের অধিকাংশটাই যাবে মন্ত্রী-এমপি-আমলা-সরকারি কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর পিছনে। জনকল্যাণে থাকবে কতটুকু! স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বাজেটের কী হাল? জিডিপির নিরিখে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ ২ শতাংশের কম। সকলের জন্য স্বাস্থ্যের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে সরকার বিপিএল পরিবারগুলির জন্য ১ লক্ষ টাকা করে স্বাস্থ্যবিমার কথা বলেছে। পরিকল্পনাটা হল, সরকার দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যের দায়িত্বটা পুরোপুরি বেসরকারি মালিকদের হাতেই তুলে দিতে চায়। যেখানে সরকারের ভূমিকা থাকবে কেবলমাত্র ম্যানেজারের। মা ও শিশু বিকাশ এবং আইসিডিএস প্রকল্পে গত বাজেটেই ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ কমানো হয়েছিল। এবারেও বরাদ্দ কমেছে। এদেশে আজও ৩৫.৭৩ শতাংশ মানুষ (২৮ কোটি ১৩ লক্ষ) নিরক্ষর, কলেজ পর্যন্ত যেতে পারে জনসংখ্যার মাত্র ৩.৪৫ শতাংশ। অথচ শিক্ষায় বরাদ্দ গত বছরের থেকেও কমে ৩.৭ শতাংশ হয়েছে। বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, অসহায় বিধবাদের কল্যাণে সামাজিক সহায়তা এবং অন্নপূর্ণা যোজনায় বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা। বৃদ্ধ ও বিধবাদের ন্যূনতম পেনশন ৩০০ টাকাই থেকে গেছে। কৃষিতে যে ফসলের বিমার কথা বলা হয়েছে তাতে ২০ শতাংশের বেশি কৃষকের প্রয়োজন মিটবে না। ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা, যাতে গত বছরের বকেয়া মজুরিও মিটবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডের জমা টাকার উপর কর বসিয়ে দরিদ্রতম ১০ কোটি শ্রমিকের সর্বনাশ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে কর্পোরেট জগতের প্রত্যক্ষ কর কমেছে ১০৬০ কোটি টাকা। দেশের সমস্ত মানুষ যে পরোক্ষ কর দেন তা বেড়েছে ১৯ হাজার ৬১০ কোটি টাকা। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই)-এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কয়লার উপর সেস দ্বিগুণ বাড়িয়ে মেট্রিক টন প্রতি ৪০০ টাকা করা হয়েছে। যার ফলে বাড়বে বিদ্যুতের দাম। কৃষি নিয়ে এত বাগাড়ম্বর, সরকার নাকি সেচের ব্যবস্থা করতে দরাজ হাত— কিন্তু বিদ্যুতের দাম বাড়লে সেচের পাম্প চালিয়ে ফসলে জল দিতে পারবে কতজন চাষি! ২০১২-১৩ সাল থেকে এই পর্যন্ত একচেটিয়া মালিকদের অন্তঃশুল্ক, বহিঃশুল্ক এবং ঋণ মিলিয়ে ৫.৩২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে। পেট্রপণ্যের দাম সারা বিশ্বেই তলানিতে নেমেছে। বর্তমানে আমাদের দেশের তেল পরিশোধনাগারগুলি ১২.৫০ টাকা দরে এক লিটার অপরিশোধিত তেল কেনে, যেখানে এক লিটার জলের দাম ১৫ থেকে ২০ টাকা। অথচ বাজারে এক লিটার পেট্রোলের দাম ৬৪.৬৪ টাকা, ডিজেল ৪৮.৩৩ টাকা। এই সুযোগে আম্বানিদের মতো ধনকুবেররা বিপুল লাভ তুলেছে। সেই আম্বানিদের মতো তেল কোম্পানির মালিকদের ২০ শতাংশ অয়েল ডেভেলপমেন্ট সেস পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। খাদ্য, সার ও খনিজ তেলের কোম্পানিগুলিকে সরকার যে ২ লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি পাইয়ে দিয়েছে তা জেটলি সাহেব নিজেই বলেছেন। এর সাথে যুক্ত করতে হবে গত দুই বছরে একচেটিয়া মালিকদের সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার রাজস্ব ছাড় দেওয়াকে।

কালো টাকা ফিরিয়ে আনার বাগাড়ম্বর ভুলে দেশীয় মালিকদের সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সামান্য কিছু করের প্রসাধন মাখিয়ে নিলেই তাদের সব কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ধুঁকছে একচেটিয়া মালিকদের কাছ থেকে অনাদায়ী ঋণের জন্য। জিডিপির ১৪ শতাংশই কর্পোরেটদের কাছ থেকে অনাদায়ী ঋণ। অথচ তাদের থেকে প্রাপ্য আদায় না করে সরকারি কোষাগারের ২৫ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কের মূলধন ভরা হবে। গ্রামভারতের উন্নতির ঢাক পেটানোর শব্দে চাপা পড়ে গেছে সাড়ে ৫৬ হাজার কোটি টাকার সরকারি কোম্পানির বিলগ্নিকরণের সর্বনাশা প্রস্তাব।

মোদি সরকারের এই বাজেটের ফলে সংস্কার ভেসে গেল বলে যে রব তোলা হয়েছে, সেটাও পরিকল্পিত। মানুষের চোখ আসল জায়গা থেকে ঘুরিয়ে দিতেই এই হইচই। আজ আর কোনও সরকারের সাহস হচ্ছে না উদারিকরণ করছি, আর্থিক সংস্কার করছি এ কথা '৯০ দশকের মতো বুক ফুলিয়ে বলার। তখন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের সুযোগে মানুষের ঘাড়ে বিশ্বায়ন, উদারিকরণ চাপিয়ে দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীরা। উদারিকরণের কোনও প্রতিশ্রুত ফল মানুষ পায়নি। আজ বিশ্ব জুড়েই এই বিশ্বায়ন, উদারিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে। ১ শতাংশের জন্য ৯৯ শতাংশকে বলি দেওয়া যাবে না বলে দেশে দেশে আন্দোলন হচ্ছে। আবার স্লোগান উঠছে পুঁজিবাদ নয়, সমাজতন্ত্র চাই। কোনও টোটকা দিয়েই যে পুঁজিবাদ মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, তা মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে তাই মোদিজি উন্নয়নের আলখাল্লার উপর আবার গরিব দরদের উত্তরীয়টা জড়িয়েছেন। কিন্তু এই কৌশল বেশি দিন খাটবে না।

## জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এস ইউ সি আই (সি) দলের কুলতলী ব্লকের মেরিগঞ্জ-১ লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সোহারব মোল্লা ১৯ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ রোগভোগের পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। '৭০-এর দশকের প্রথম দিকে শহিদ কমরেড মোকাররম খাঁন ও প্রয়াত নেতা কমরেড তরণী মণ্ডলের সংস্পর্শে এসে দলের সাথে তিনি যুক্ত হন এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কমরেড মোকাররম খাঁন যে ক'জন সহযোগী নিয়ে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমরেড সোহারব মোল্লা।

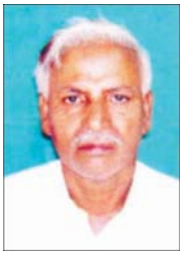

কমরেড সোহারব মোল্লা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও দলের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে গরিব সর্বহারা, মানুষের সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর ভাইদের ও গোটা পরিবারকে দলের সাথে যুক্ত করেন। বেনাম ও খাস জমি উদ্ধার, খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন সহ বিভিন্ন সংগ্রামে এই এলাকায় অগ্রণী ছিলেন তিনি। এজন্য কংগ্রেস, সিপিএম ও বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়েছে, বারবার ঘর ছাড়া হতে হয়েছে। সম্প্রতি তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডাদের আক্রমণে ঘরছাড়া হয়ে অসুস্থ অবস্থায় মেরিগঞ্জ আমতলী এলাকায় তাঁর দাদার বাড়িতে ছিলেন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কমরেড সোহারব মোল্লার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার অগণিত কর্মী, সমর্থক, দরদিদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে এবং তাঁরা তাঁদের প্রিয় নেতাকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে দলে দলে উপস্থিত হন। মৃত্যুসংবাদ পেয়েই আসেন এস ইউ সি আই (সি) দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাদল সর্দার, মেরিগঞ্জ-১ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আইয়ুব খাঁন। পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। কমরেড সোহারব মোল্লার অকালমৃত্যুতে দল হারাল এক সংগ্রামী, সংস্কৃতিবান দরদি মনের কর্মীকে।

**কমরেড সোহারব মোল্লা লাল সেলাম**

## ভ্রম সংশোধন

গণদাবী-র ৬৮ বর্ষ ৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে অবরোধ জয়নগরে' শীর্ষক সংবাদে এস ইউ সি আই (সি) ফুটিগোদা (২) আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড শক্তি হালদারের পদবি ভুলক্রমে মণ্ডল ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

# তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আন্দোলন করেছে এস ইউ সি আই (সি)

*তিনের পাতার পর*

কংগ্রেসকে ওরা এই সার্টিফিকেট দিচ্ছে। কতবড় একটা ক্ষতি করছে শুধু ভোটের স্বার্থে। কংগ্রেস একটা জাতীয় বুর্জোয়া দল। চরম অগণতান্ত্রিক পার্টি, দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় না থেকে প্রায় নির্জীব হয়েছিল, আজ তাকেই চাঙ্গা করে তুলছে ওরা ভোটের স্বার্থে। তৃণমূল সরকারে আছে ঠিক, সন্ত্রাসও চালাচ্ছে এটাও ঠিক। কিন্তু ১৯৭২ সালে কংগ্রেস সরকার যে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস চালিয়েছিল, তার তুলনায় এটা কতটা! তাছাড়া তৃণমূল যদি এবারও সরকার দখল করে, পরের বার পারবে কি? কেন্দ্রে যেমন সরকার বদল হচ্ছে, অন্য রাজ্যেও হচ্ছে, এ রাজ্যেও হবে। সরকার হাতছাড়া হলে, তৃণমূলের অস্তিত্বও থাকবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কংগ্রেস জাতীয় বুর্জোয়া দল, দীর্ঘদিন পুঁজিবাদের সেবা করে আসছে, পুঁজিবাদ তাকে দীর্ঘদিন মদত দিয়ে টিকিয়ে রাখবে। আজ সিপিএম সেই কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে বামপন্থী আদর্শ বিসর্জন দিয়ে। আমি ওদের পার্টি কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে আমাদের দলের তরফ থেকে গিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, জঙ্গি বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলুন গোটা দেশে। ভারতবর্ষে প্রায় সব রাজ্যে আমরা আছি, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা যায়। লেনিনের শিক্ষা উল্লেখ করে বলেছি, একটা বিপ্লবী দলের শক্তির উৎস পার্লামেন্টে মেম্বারের সংখ্যা নয়, শক্তির উৎস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের আগুন। বলেছি, বামপন্থার গৌরবময় ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনুন। পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকে, সারা দেশে কংগ্রেস আর বামপন্থী ছাড়া আর কেউ ছিল না। কোথায় ছিল তখন বিজেপি। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনেই কলকাতা শহরে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল, এই বামপন্থী ঐতিহ্যকে নিয়েই তা হয়েছিল। এটাই ছিল তখনকার ঐতিহ্য। কিন্তু সিপিএমের অ-বাম নীতির ফলে, ক্রমাগত বামপন্থা থেকে বিচ্যুতির ফলে বামপন্থার সেই গৌরবময় ঐতিহ্য অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। বিশেষ ভাবে নষ্ট হয়েছে তাদের ৩৪ বছরের শাসনে।

ওরা বলছে— তৃণমূলের সন্ত্রাস, কাজ করা যাচ্ছে না। আমি ওদের এক প্রবীণ নেতাকে বলেছিলাম, '৭২ সালে কংগ্রেসের যে সন্ত্রাস ছিল, তা তৃণমূলের আজকের সন্ত্রাসের থেকেও ভয়ঙ্কর ছিল। আপনাদের উপর আক্রমণ হয়েছে, আমাদের উপরও আক্রমণ হয়েছে। তখন আমরা যেমন মোকাবিলা করেছি, আপনারাও কিছু মোকাবিলা করতে পেরেছেন, কিন্তু এখন পারছেন না কেন? তিনি যে উত্তর দিয়েছেন, সেটা আমি এখানে বলব না। আমি ময়দানে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম সিপিএম নেতৃত্বকে, লেনিনের শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে বলেছিলাম, আপনারা জনগণের সামনে প্রকাশ্যে আপনাদের ভুল-ভ্রান্তি-অন্যায় স্বীকার করুন। লেনিন বলেছিলেন, প্রকৃত কমিউনিস্টরা ভুল করলে জনগণের সামনে তা স্বীকার করবে, কী ভুল করেছে, কেন ভুল করেছে সেটা স্বীকার করবে, কীভাবে সংশোধন করবে, সেটাও জনগণকে বলবে। এইভাবেই জনগণের আস্থা অর্জন করবে। আর এটাই একটা যথার্থ কমিউনিস্ট দলের পরিচয়। কমিউনিস্ট নয় বলেই সেই পথে যেতে সিপিএম নেতৃত্ব পারলেন না। আজ সিপিএমের লোকজন তো কম নেই, তারা মোকাবিলা করতে পারছে না কেন? কেন কংগ্রেসের কাঁধে ভর দিয়ে চলতে হচ্ছে তাদের? মোকাবিলা করতে পারছে না— তার কারণ, জনগণের মধ্যেই এই কথা রয়েছে, তৃণমূল কী সন্ত্রাস করছে, এর থেকে অনেক বেশি করেছে সিপিএম। এটা জনগণের কথা। কেউ কেউ বলছে, সিপিএমের মতোই তৃণমূল করছে। আবার কেউ কেউ বলছে, তৃণমূল সিপিএম-কেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই তো কথা চলছে। ফলে সিপিএম জনসাধারণের মধ্যে জায়গা করতে পারছে না। ওদের কর্মীদের দোষ দিয়ে লাভ কী? কর্মীরা জনগণের মুখোমুখি হবেন কী করে? জনগণের মধ্যে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা চাই তো। ভুল স্বীকার করে আন্দোলনের পথে চললে ধীরে ধীরে বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরতে পারত। সেই রাস্তায় তারা গেল না। তারপর, কর্মীদের মনোবল নষ্ট করেছে। তারা কোনও দিনই বিপ্লবী দল ছিল না— এটা ঠিক, ফলে বিপ্লবী রাজনীতি, বিপ্লবী সংস্কৃতির চর্চাও কোনও দিনই করেনি। তবুও অতীতে সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনে থেকে কর্মীদের যে লড়বার মন ছিল, সরকারি ক্ষমতায় থেকে থেকে ৩৪ বছরে সেটাও নষ্ট করেছে। সরকারি পাওয়ার না থাকলে, পুলিশ-প্রশাসন হাতে না থাকলে, অ্যান্টিসোস্যাল পক্ষে না থাকলে তারা এখন জোর পায় না। অথচ পাঁচ-ছয়ের দশকে ঐক্যবদ্ধ সিপিআই দলের কর্মীরা, ১৯৬৪ সাল থেকে পরবর্তী কয়েক বছর সিপিএম দলের কর্মীরা কত লড়াকু ছিলেন। বুর্জোয়া পথে সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে আজ দলের এই দশা হয়েছে। গণআন্দোলন, গণসংগ্রামগুলি গড়ে তোলা দূরের কথা, ৩৪ বছরে পুলিশি অত্যাচার চালিয়ে গণআন্দোলনকে ধ্বংস করেছে, শ্রমিক আন্দোলনকে, কৃষক আন্দোলনকে ধ্বংস করেছে। কর্মীদের মনোবল থাকবে কোথা থেকে! তা ছাড়া কর্মীরাই মনে করেন, 'তৃণমূল এখন যা করছে, আমরাও তো সরকারে থেকে তা কম করিনি'। এই অবস্থায় ভেতর থেকে মানসিক জোরটা আসতে পারে না। অথচ সিপিএম নেতারা নিচুতলার কর্মীদের ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে নিজেদের গা বাঁচাচ্ছেন। এই হচ্ছে সমস্যা।

### তেরঙ্গা ঝান্ডা আর লাল ঝান্ডা নিয়ে একসঙ্গে মিটিং-মিছিল? সিপিএম কর্মীরা ভেবে দেখুন

এই কথাও আমি বলছি, সিপিএমের এখনও যতটুকু শক্তি আছে, সিট বাড়তে পারে, কমতে পারে, আমি সে হিসাবে যাচ্ছি না। কিন্তু যে রাস্তায় তারা চলছে তাতে দলের যে শক্তি এখনও তাদের আছে, সেটাও তারা রক্ষা করতে পারবে না। সিপিএম নেতাদের ভেবে দেখা দরকার। সিপিএমের ভেতরে যাঁরা এর বিরুদ্ধে আছেন—নেতাদের একটা অংশ, কর্মীদের একটা অংশ, আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। তাঁরা দুঃখ পাচ্ছেন, তাঁরা এটাকে সমর্থন করছেন না। আমরা তাঁদের ওয়েলকাম করছি। এতদিন বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল— এরা দক্ষিণপন্থী, ওরা বামপন্থী, এভাবে মানুষ জানত ও ভাবত, সেটা সিপিএম নেতারা মুছে দিচ্ছেন। তেরঙ্গা ঝান্ডা আর লাল ঝান্ডা নিয়ে একসঙ্গে মিটিং-মিছিল করছেন। এটা কি আগে কেউ দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেছিল? অবিভক্ত বাংলায় একদিন বাঘা বাঘা দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতারা, এমনকী গান্ধীজি-নেহেরুরা পর্যন্ত বিশেষ জায়গা করতে পারেননি। গান্ধীবাদীরা বাংলার বিপ্লবীদের-ক্ষুদিরামদের মর্যাদা দেননি, নেতাজিকে কংগ্রেস সভাপতি পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন, কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করে বের করে দিয়েছিলেন। সেইজন্য পাঁচ-ছয়ের দশকে জনগণের মধ্যে, বিশেষত শিক্ষিত মহলে বামপন্থার জোয়ার ছিল, দক্ষিণপন্থীদের জায়গা ছিল না। তখন বামপন্থীরা সরকার করতে পারবে, এই ভাবনাও ছিল না, অথচ এইরকমই পরিবেশ ছিল। আজ সিপিএম সেই রাজ্যকে কোথায় নিয়ে এল— সিপিএম নেতা ও কর্মীরা একবার ভেবে দেখুন। কোনও বিদ্বেষ থেকে এ কথা বলছি না, ব্যথা ও উদ্বেগ থেকেই বলছি। আপনাদের শাসনে আমাদের এত কর্মী খুন হয়েছেন, আমাদের উপর কত অত্যাচার হয়েছে, যেহেতু আমরা একটা বিপ্লবী দল হিসাবে সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডা বহন করছি। এসবই বিমান বসুর উপস্থিতিতে প্রকাশ কারাটকে বলেছি। দু'জনেই চুপ করে ছিলেন। এতদসত্ত্বেও বামপন্থার স্বার্থেই আমরা ছয় দলীয় বাম ঐক্যে সামিল হয়েছি। আমরা বলেছিলাম, একটা বামপন্থী ঐক্যের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এর বিস্তার চাই, একে ধাপে ধাপে শক্তিশালী করা চাই। কিন্তু সিপিএম সে পথে গেল না এবং এর দ্বারা বামপন্থী আন্দোলনের মারাত্মক ক্ষতি করল।

এই অবস্থায় আমরা নির্বাচনে একা দাঁড়িয়েছি বামপন্থার মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য, সংগ্রামী বামপন্থার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য। আমরা দাঁড়িয়েছি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য, আমরা দাঁড়িয়েছি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য। আমরা দাঁড়িয়েছি ভারতবর্ষে ও পশ্চিমবাংলায় বিজেপির এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে যেসব বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ সাংবাদিক আইনজীবী চিন্তাশীল মহল সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের এই প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করার জন্য। এই বক্তব্য নিয়েই আমরা নির্বাচনে দাঁড়াব। আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিমবাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, বামপন্থী চেতনাসম্পন্ন মানুষ, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়াবেন। আমরা চাইলে সিপিএম-কংগ্রেস জোটে সামিল হতে পারতাম। আমাদের কিছু সিট হয়ত থাকত, বাড়ত। আমরা চাইলে তৃণমূলের সাথে যেতে পারতাম, আমাদের কিছু সিট বাড়ত, থাকত। আমরা কিন্তু সে পথে যাইনি। আমরা ভোটের রাজনীতি এভাবে দেখি না। ভোটটা আমাদের কাছে একটা আন্দোলন, একটা লড়াই, নীতি-আদর্শভিত্তিক লড়াই। সেভাবেই আমরা জিনিসটাকে দেখি। আমাদের দলের কাছে কয়েক শত এম এল এ, এম পি-র চেয়েও একজন ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা খান, প্রীতিলতা চরিত্র অনেক মূল্যবান, যাঁরা প্রাণ দিয়ে বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করবেন। সিট পেলে ভাল, না পেলেও আমাদের লড়াই চলবে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায়।

আজ ভারতের অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে পশ্চিমবাংলারও কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! মদ-জুয়া-সাট্টা-ড্রাগের নেশায়, নোংরা যৌনতায় ছাত্র-যুব সমাজকে নিমজ্জিত করা হচ্ছে। পিতৃত্ব-মাতৃত্ব অসম্মানিত, নারীর মর্যাদা বিপন্ন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন বাড়ছেই। শিশুকন্যা, বৃদ্ধা মহিলারাও রেহাই পাচ্ছেন না। পশুরাও তো ধর্ষণ করে না, গণধর্ষণ করে না। এরা কি মানুষ! পশুরও অধম। কে এদের জন্ম দিল? এরা মৃতপ্রায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফসল। মৃতপ্রায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছে, এদের জন্ম দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শাসন, সিপিএম শাসন, তৃণমূল শাসন চলছে। তাদের শাসনে এই সবই ঘটে যাচ্ছে। আজ পশ্চিমবাংলার এই দশা দেখে কেউ বিস্মিত হয়ে ভাবতে পারে যে, একদিন সত্যই কি এখানে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল-দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্র-ক্ষুদিরাম-প্রীতিলতারা জন্ম নিয়েছিলেন? কোথায় সেই গৌরব? তৃণমূলও যে পরিবর্তনের স্লোগান নিয়ে এসেছিল, কোথায় সেই পরিবর্তন! তৃণমূল নতুন যা করছে সেটা হচ্ছে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, ছাত্রশ্রী, অমুকশ্রী, তমুকশ্রী, সাইকেল দান, জুতো দান— এইসব। তাতে ওদের ভোটে কিছু শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে, কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু গোটা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গও প্রায় শ্রীহীন কালো অন্ধকারে সব দিক থেকে ডুবে যাচ্ছে।

### এস ইউ সি আই (সি)-র শক্তির উৎস বিপ্লবী আদর্শ, উন্নত নৈতিক বল এবং সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালবাসা

ফলে আমরা লড়ছি কেন্দ্রের বিজেপির বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং সিপিএমের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে। এইসব কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমরা সেভাবেই লড়ব।

**আমরা এটাও জানি, অন্যান্য দলগুলি শিল্পপতি, বড় ব্যবসাদার, কালোবাজারিদের টাকা— অর্থাৎ, মানি পাওয়ারের জোরে লড়ে। সেই টাকায় তারা ক্রিমিনালদের কাজে লাগায়। মালিকশ্রেণি নিয়ন্ত্রিত কাগজ, টিভি ওদেরই প্রচার দেয়। ইলেকশন কমিশনও ভোটের আগে ফ্রি-ফেয়ার ইলেকশনের নামে অনেক মহড়া দেয়, আবার রিগিংও চলে। এ সবের বিরুদ্ধে গরিব মানুষের দল হিসাবে আমাদের একাই লড়াই করতে হবে। আমাদের শক্তির উৎস দলের বিপ্লবী আদর্শ, উন্নত নৈতিক বল এবং সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালোবাসা। এর চেয়ে বড় শক্তি আর কিছুই নেই। এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা লড়ছি।**

**আমরা জনগণকে, ছাত্র-যুবকদের আবেদন করছি, মিথ্যা বুলিতে বিভ্রান্ত হবেন না, টাকার লোভে নিজেদের বিবেককে বিক্রি করবেন না। আত্মমর্যাদা ও মনুষ্যত্ব নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান। সর্বযুগের বড় মানুষদের, ব্রিটিশ শাসিত যুগের মনীষীদের, বিপ্লবীদের স্মরণ করুন। আজ পুঁজিবাদ দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, মনুষ্যত্ব, সমাজ জীবন, পারিবারিক জীবন, নারীর নিরাপত্তা, স্নেহ-মমতা সবকিছু ধ্বংস করছে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে চাই পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সর্বহারার মহান নেতা শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল সেই বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করে যাচ্ছে। এই দলকে শক্তিশালী করুন, নির্বাচনেও সমর্থন করুন।**

### সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে

**সাংবাদিক ঃ** প্রভাসবাবু, আপনারা এবং হয়ত আপনাদের সাথে সিপিআইএমএল (লিবারেশন) থাকবে, কিন্তু আপনারা তো গভর্নমেন্ট করতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে তৃণমূলের গভর্নমেন্ট বা কংগ্রেস-সিপিএম জোটের গভর্নমেন্ট কোনটাকে পেলে আপনি বেশি খুশি হবেন বা অখুশি হবেন?

**প্রভাস ঘোষ ঃ** আমার খুশি বা অখুশি হওয়ার কিছু নেই। কোনও গভর্নমেন্টই জনগণের জন্য কিছু করবে না। জঙ্গিবামপন্থী আন্দোলনের ভিত্তিতে যদি কোনও গভর্নমেন্ট আসে পুরনো যুক্তফ্রন্টের ঐতিহ্য নিয়ে, একমাত্র সেই গভর্নমেন্টই কিছু করতে পারবে।

*সাতের পাতায় দেখুন*

# বামপন্থী আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেসের সাথে ঐক্য করে সিপিএম বামপন্থী আন্দোলনের মারাত্মক ক্ষতি করল

*ছয়ের পাতার পর*

**সাংবাদিক ঃ** প্রভাসবাবু, আরেকটা অভিযোগ উঠবে যে, আপনারা নিজেদের বিরোধী বলেন তো, বিরোধী ভোট কেটে তৃণমূলের আসার পথ সুগম করে দেবেন।

**প্রভাস ঘোষ ঃ** যাঁরা আমাদের সমর্থন করেন, আমরা তাঁদের ভোট পাব। অন্যের ভোট আমরা কাটতে যাব কেন? আমাদের পার্টিকে যাঁরা সমর্থন করবেন, আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করবেন, তাঁরা আমাদেরই ভোট দেবেন। ভোট তো কারওরই পকেটে নেই, ভোট দেয় জনগণ। জনগণ যাকে সমর্থন করবে, তাকেই দেবে। কারও ভোট কেড়ে নেওয়ার কোনও ক্ষমতা আমাদের নেই। অন্যরা বরং প্রচুর টাকা নিয়ে নামে— টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করে, মদ- মাংস খাওয়ায়। আমরা এইসব নোংরামি করি না, দেশের জনগণ জানেন। আমাদের দলই একমাত্র দল যে রাস্তায় রাস্তায় হাত পেতে, দরজায় দরজায় গিয়ে চাঁদা তোলে এবং তা দিয়ে দলের প্রচার চালায়, আন্দোলন করে, ভোটও করে।

**সাংবাদিক ঃ** আপনারাও এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে ভোটে ঐক্য করেছিলেন, তা হলে সিপিএম কংগ্রেসের সাথে করেছে বলে বিরোধিতা করছেন কেন?

**প্রভাস ঘোষ ঃ** কেন আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে ঐক্যে গিয়েছিলাম, এর উত্তর কয়েকবার পাবলিক মিটিং-এ দিয়েছি। আপনাকে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। প্রথমত, আমরা ভোটের প্রয়োজনে তখন ঐক্য করিনি। অনেকেই জানেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন আমাদের দলই প্রথমে উদ্যোগ নিয়ে গড়ে তোলে, এই আন্দোলনের উপর বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক আক্রমণ চালায়। সেই সময় তৃণমূল এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের সাথে ঐক্য চায়। যদিও আমাদের লক্ষ্য ও তাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। আমরা বিপ্লবী দল হিসাবে, জনগণকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে দাবি আদায়ের জন্য শেষপর্যন্ত লড়ি, আর ওদের লক্ষ্য ছিল আন্দোলনে থেকে প্রভাব বাড়িয়ে সরকার বিরোধী মনোভাবকে ভোটে কাজে লাগানো। এটা আমরা জানতাম। কিন্তু আমরা একা বামফ্রন্ট সরকারের আক্রমণ মোকাবিলা করে আন্দোলনকে রক্ষা করতে পারতাম না। তাছাড়া আমরা আন্দোলন করলে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম প্রচার দেয় না, যেটা ওদের পছন্দের দল তৃণমূলকে দেয়। এই অবস্থায় আন্দোলনের স্বার্থে আমরা তৃণমূলের সাথে ঐক্যে যাই, তাও প্রথম দিকে দলীয় স্তরে ওরা চাইলেও ঐক্য করিনি। সিঙ্গুরে 'কৃষি জমি রক্ষা কমিটি' ও নন্দীগ্রামে 'ভুমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি' এই দুই পাবলিক কমিটি করে আন্দোলন করেছি। এর আগে তৃণমূল যখন একা করেছে, তখন অবস্থান, ধরনা, পদযাত্রা, অনশন এসব করেছে, কোনও দাবিও আদায় করতে পারেনি। কিন্তু আমরা থাকার ফলে দু'জায়গাতেই নিচু স্তরে পাবলিক কমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে স্থায়ী আন্দোলন করা গেছে। যদিও আপনাদের জানা দরকার, সিঙ্গুরে বামফ্রন্ট সরকার জমি দখল করে টাটাকে দিতেই পারত না, আমাদের দলের উদ্যোগে সিঙ্গুরে গরিব চাষি, নারী-পুরুষ দুইদিন পুলিশের মার খেয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম করেছিলেন, কিন্তু তৃণমূল এই ধরনের আন্দোলন চায়নি। ওদের নেত্রী অনশন শুরু করে প্রচার করিয়ে দিলেন যে, অনশনের দ্বারাই দাবি আদায় করা হবে। এইভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনকে থামিয়ে দিলেন, আর সেই সুযোগে বামফ্রন্ট সরকার জমি দখল করে নিল। আমরা তখনই প্রকাশ্যে তৃণমূলের এই ভূমিকার সমালোচনা করেছিলাম, কিন্তু একা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার মতো সংগঠন সেখানে আমাদের ছিল না। তার ফলে আজও সিঙ্গুরের জমিহারা চাষিরা কষ্ট পাচ্ছেন। তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রী তো বলেই দিলেন, জমি ফেরত পেতে পঞ্চাশ বছরও লাগতে পারে আইনি লড়াইয়ে। অথচ আমরা তৃণমূল সরকার গঠনের পরও প্রস্তাব দিয়েছিলাম, চাষিরা তাদের নিজেদের জমি দখল করে নিক, পুলিশ যেন বাধা না দেয়, আর সরকার আইন করে সেটা যেন মেনে নেয়। কিন্তু তৃণমূলের কাজ হাসিল হয়ে গেছে, মন্ত্রীত্ব পেয়ে গেছে, ফলে সে পথে তারা গেল না।

কিন্তু নন্দীগ্রামের প্রতিরোধ আন্দোলন তৃণমূল নেতৃত্ব আটকাতে পারেনি, কারণ সেখানে আমাদের সংগঠন অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও আমাদের দলের দেওয়া প্রতিরোধের কর্মসূচির গুরুত্ব বুঝেছিল। ফলে নন্দীগ্রাম আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই, মার্কসবাদের শিক্ষা হচ্ছে, ভোটের স্বার্থে নয়, আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়োজনে দক্ষিণপন্থীদের সাথেও সাময়িক ঐক্য করা যায়। যেমন মহান লেনিন ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় জারের বিরুদ্ধে একজন প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মযাজকের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক বিক্ষোভে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ করিয়েছিলেন। কারণ দাবিগুলি গণতান্ত্রিক ছিল এবং নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উদঘাটনের প্রয়োজন ছিল। ঠিক একই কারণে ১৯৭৪-'৭৫ সালে জয়প্রকাশ আন্দোলনে দক্ষিণপন্থীরা আছে জেনেও আমাদের দল ছিল এবং আমরা সিপিএমকেও সামিল হতে বলেছিলাম।

এটাও আপনারা জানেন, বিগত ৩৪ বছর আমরা বামফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে লাগাতার তীব্র আন্দোলন করেছিলাম। শুধু প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষা পুনরায় চালুর জন্যই নয়, অন্যান্য বহু দাবিতে এই আন্দোলনে আমাদের দলের ১৬১ জন নেতা-কর্মী শহিদ হয়েছেন, অনেকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন সাজানো মামলায়। তা সত্ত্বেও আমরা এই দাবি তুলিনি যে, বামফ্রন্ট সরকারের পতন চাই, বিধানসভাতে ওদের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করিনি, রাজ্যসভা নির্বাচনে বারবার বামফ্রন্টের প্রার্থীদের ভোট দিয়েছি। কিন্তু নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলন দমন করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যখন নৃশংস ভাবে পুলিশ ও ক্রিমিনালদের দিয়ে গণহত্যা ও গণধর্ষণ করালো, তখন আমরা বললাম, এটা ফ্যাসিস্টিক আক্রমণ, গণআন্দোলন দমনে কংগ্রেস-বিজেপি গুলি চালিয়ে অনেক হত্যা করিয়েছে, কিন্তু গণধর্ষণ করায়নি, একমাত্র রায়টে গণধর্ষণ হয়েছে। এর ফলে ওই প্রথম আমরা দাবি তুললাম, বামফ্রন্ট সরকার 'মাস্ট গো', কারণ এর পরও এই সরকার থাকলে আন্দোলন দমনে আরও বেপরোয়া আক্রমণ চালাবে। তখন ব্যাপক জনগণও বামফ্রন্ট সরকারের পতন চাইছিল। তাছাড়া বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পক্ষে আর বিপক্ষে। আর আমরা তো এই আন্দোলন বহু মেহনত দিয়ে, মার খেয়ে গড়ে তুলেছিলাম। ফলে সেই কারণে আমরা তৃণমূলের সাথে ঐক্যে গিয়েছিলাম। তাছাড়া সব রাজনৈতিক দল, সাংবাদিক, পুলিশ, প্রশাসন সবাই জানত, নন্দীগ্রাম আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি) ছিল বলে এই প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা ও জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের জনগণও জানেন, কারা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল। কিন্তু বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম এমনভাবে প্রচার করছিল, যেন তৃণমূলই সবকিছু করেছে, যাতে জনগণ আমাদের ভূমিকা না জানতে পারে। সেই কারণেও এই ভোটের ঐক্যে যুক্ত থেকে আমাদের ভূমিকা জানানোর দরকার ছিল। আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, সেটা হচ্ছে, জনগণের যা মানসিকতা ছিল, তাতে আমরা বুঝেছিলাম, বামফ্রন্ট হারবে, তৃণমূল জিতবে। আর তৃণমূল সিপিএমকে দেখিয়ে গোটা নির্বাচনে মার্কসবাদ ও বামপন্থার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন চালাবে, যেটাও আটকানো দরকার। তৃণমূলের প্রয়োজন ছিল আমাদের দলের প্রেস্টিজকে ভোটের কাজে লাগানো, তাই আমাদের সাথে ঐক্য চেয়েছিল। এটাও আপনারা জানেন, সিপিএম কর্মীরাও জানেন, তখন পশ্চিমবঙ্গে যে প্রবল বামফ্রন্টবিরোধী জনমত ছিল, তাতে রিগিং, সন্ত্রাস ছাড়াই তৃণমূল জিতে যেত। না হলে বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অধীন আমলার কাছে এত ভোটে হারেন! আমরা ঐক্যে না থাকলে তৃণমূল ব্যাপকভাবে মার্কসবাদ ও বামপন্থার বিরুদ্ধে প্রচার করে জিতত, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ক্রেডিট আত্মসাৎ করত—সেটা আমরা বামপন্থা ও গণআন্দোলনের স্বার্থে আটকেছি।

আমরা শর্ত দিয়েছিলাম, বামফ্রন্ট বা সিপিএমকে সমালোচনা করতে গিয়ে তারা যেন মার্কসবাদ ও বামপন্থাকে আক্রমণ না করে। তৃণমূল সেটা মেনে নেয়। তখন ওদের সাথে ভোটে ঐক্য করলেও আমরা কখনও তৃণমূলকে 'গণতান্ত্রিক', 'প্রগতিশীল', 'ধর্মনিরপেক্ষ' এসব আখ্যা দিইনি। বরং তৃণমূলের সাথে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছি, তৃণমূল মনে করে, ভোটে জিতে সরকার করলেই সব করে দেবে, কিন্তু আমরা তা মনে করি না, আমরা মনে করি, জনগণের সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে বিপ্লবের মাধ্যমে। বলেছি, তৃণমূল সরকারে গেলেও আগেকার কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট সরকারের মতোই প্রশাসন চালাবে এবং যে মুহূর্তে তৃণমূল সরকার গঠন করবে, আমরা তখন থেকেই রাস্তায় নেমে আন্দোলন চালাব। এটাও জেনে রাখুন, আমাদের দলই প্রথম তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ফলে মূলত তিনটি কারণে তৃণমূলের সাথে ঐক্যে গিয়েছিলাম ঃ (১) নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলনের ভিত্তিতে জোট হয়েছিল, আর সেই আন্দোলন আমাদের দল শুরু করেছিল, (২) এই আন্দোলনের দাবি হিসাবে এসেছিল, বামফ্রন্ট সরকারের পতন চাই, (৩) নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল যেন মার্কসবাদ ও বামপন্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে না পারে। ইতিপূর্বে সরকারে থাকাকালীন বামফ্রন্ট ২০০৬ সালে আমাদের ঐক্যের প্রস্তাব দিয়েছিল, রাজি হলে আমাদের এম এল এ বাড়ত, মন্ত্রীত্ব পেতাম, কিন্তু আমরা রাজি হইনি, যেহেতু তারা বামপন্থা বর্জিত পথে চলছিল। তৃণমূলও আগে প্রস্তাব দিয়েছিল, আমরা রাজি হইনি। সিটের জন্য নয়, মন্ত্রীত্বের জন্য নয়, আমরা ঐক্যে যাই জনগণের স্বার্থে, গণআন্দোলনের স্বার্থে, আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে।

আপনারা এটাও জেনে রাখুন, গত বিধানসভা ভোটের পর তৃণমূল আমাদের মন্ত্রীত্বের অফার দিয়েছিল, কিন্তু আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। আমরা চাইলে তৃণমূলের সাথে বোঝাপড়া করে এবারও লোকসভা ভোটে জয়নগর হয়তো পেতাম, কিন্তু সেই পথে যাইনি, ফলে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন যদি না হত, তা হলে তৃণমূলের সাথে আমাদের দলের ঐক্যের প্রশ্নও আসত না। সিপিএম তো এবার কংগ্রেসের সাথে ঐক্য করছে ভোটের স্বার্থে, আন্দোলনের স্বার্থে নয়, বা আন্দোলনের ভিত্তিতে নয়। তাছাড়া এটাও খেয়াল রাখা দরকার, কংগ্রেস প্রথম থেকেই জাতীয় বুর্জোয়াদের বিশ্বস্ত দল, আর তুলনায় তৃণমূল হচ্ছে একটা আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল। আর তার স্থায়িত্বই বা ক'দিন?

সাংবাদিক ঃ তৃণমূল তো ভোটে কংগ্রেসের সাথে জোট করেছিল, তা সত্ত্বেও আপনারা তখন জোট ছাড়েননি, তা হলে আপনারা এখন কংগ্রেসের সাথে ঐক্য করায় সিপিএমের সাথে যাচ্ছেন না কেন?

প্রভাস ঘোষ ঃ আমরা তখন কংগ্রেসের সাথে তৃণমূলের জোটের তীব্র বিরোধিতা করেছিলাম, এবং ঐক্যে থাকব না—এই কথাও বলেছিলাম। সেই সময় প্রবল পাবলিক সেন্টিমেন্ট ছিল যেভাবেই হোক বামফ্রন্টকে হারাতে হবে। সংবাদমাধ্যমে যখন প্রচার হয় যে, আমাদের দল এই ঐক্যে থাকবে না, তখন নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের আন্দোলনকারী জনগণ, পশ্চিমবঙ্গে বহু স্থানের মানুষ আমাদের অনুরোধ করতে থাকে, আমরা যেন ঐক্য থেকে বেরিয়ে না যাই। যেসব বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলনের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁরাও বারবার একই অনুরোধ করতে থাকেন। এই অবস্থায় আমরা বলি, আমরা শুধু তৃণমূলের সাথে ঐক্যে থাকব, কিন্তু কংগ্রেসের সাথে যাব না। প্রথমে তৃণমূল নেতৃত্ব মানতে চাইছিল না, কিন্তু দৃঢ়তার সাথে এই বক্তব্যে আমরা অটল থাকি। তখন বাধ্য হয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব আমাদের দাবি মেনে নেয়। সেটা হচ্ছে যেখানে তৃণমূল সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী থাকবে, সেখানে আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেব। আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছিও। এই হচ্ছে ঘটনা। তখন সংবাদমাধ্যমে এইসব খবর বেরিয়েছিল। ফলে দুটোর তুলনা চলে না।

**সাংবাদিক ঃ** প্রভাসবাবু, জাতীয় স্তরে ছয় পার্টির জোট আছে, এর পরেও কি থাকবে?

**প্রভাস ঘোষ ঃ** হ্যাঁ, অবশ্যই। অন্য রাজ্যেও আছে এবং থাকবে।

**সাংবাদিক ঃ** যদি ধরুন এরকম হয়, কংগ্রেস হাইকম্যান্ড বলল, লেফটদের সঙ্গে কোনও রকম জোট নয়। তখন আপনারা সিপিএমের সঙ্গে জোটে যাবেন?

**প্রভাস ঘোষ ঃ** লেফটরা যদি রাজি থাকে অবশ্যই বোঝাপড়ায় যাব। আমি তো আগেই বলেছি, দুটো জেলা বাদ দিয়ে বাকি জেলাগুলিতে আসন সমঝোতা হতে পারে। সেটা থাকবে।

**সাংবাদিক ঃ** তা হলে এখানে আপনারা বামপন্থীদের বিরুদ্ধেই লড়ছেন?

**প্রভাস ঘোষ ঃ** এটা ঠিক নয়, আমরাও তো বামপন্থী, তা হলে আমরা বাম রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়ব কেন? আমরা লড়ছি, কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি, রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল, জাতীয় বুর্জোয়া পার্টি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং সিপিএম সহ বামফ্রন্টের অন্যান্য দলের কংগ্রেসের সাথে ঐক্যের সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18



## মস্কোয় স্ট্যালিন স্মরণ

*৫ মার্চ স্মরণ দিবসে মস্কোয় মহান নেতাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানান রাশিয়ার মানুষ*

## মহান স্ট্যালিন স্মরণে

*৫ মার্চ স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন ও মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু সহ অন্যান্য রাজ্য নেতারা।*

# সিঙ্গুরে জমি ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করতে পারেন না

এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো এক চিঠিতে বলেছেন, ২৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফেরত প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন, "সিঙ্গুরের জমি ফেরতের আইন করে দিয়েছি, বিষয়টা আদালতে বিচারাধীন। আমাদের কাজ করে দিয়েছি, বিষয়টা আদালতের ব্যাপার। পাঁচ বছর কেন, পঞ্চাশ বছর গেলেও আমাদের কিছু করার নেই।" আপনার এই কথা সিঙ্গুরের জমিহারা কৃষক পরিবারগুলির কাছে এক মর্মান্তিক আঘাত।

আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, ২০০৬ সালের ২৫ মে টাটার পরিদর্শক-টিম সিঙ্গুরে গেলে কৃষকদের প্রবল বিক্ষোভের সামনে পড়ে তাদের ফিরে যেতে হয়। এর পর গড়ে ওঠে 'সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'। এই কমিটি আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচি নিতে থাকে। বিডিও অফিসে ২৫ সেপ্টেম্বর জমির ক্ষতিপূরণের চেক জমির মালিকের পরিবর্তে এক সিপিএম সমর্থক নিতে গেলে কৃষি জমি রক্ষা কমিটির সদস্যরা বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলতে থাকে। আলো নিভিয়ে দিয়ে, বিপুল সংখ্যায় পুলিশ, কমব্যাট ফোর্স ও র‍্যাফ রাত্রির অন্ধকারে আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ চালায়। সেই আক্রমণে গুরুতর আহত তরুণ রাজকুমার ভুল পরদিন শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। পরে আন্দোলন করার অপরাধে কিশোরী তাপসী মালিককে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। আন্দোলনে ব্যাপক মানুষকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমাদের উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। সিঙ্গুরের জমি দখলের পরিকল্পনার প্রতিবাদে ৯ অক্টোবর রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল হয়।

১ ও ২ ডিসেম্বর বিশাল পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স, আধা সামরিক বাহিনী নামিয়ে সরকার জমি দখলে নামে। কিন্তু সিঙ্গুরের মানুষ মাথা নত করেনি। আমাদের দলের কর্মীরা পুলিশের অত্যাচারের মুখেও কৃষকদের পাশে থাকে। টিভিতে সেদিনের পুলিশি অত্যাচারের দৃশ্য দেখে মানুষ শিউরে উঠেছিল। আমাদের দল চেয়েছিল, কৃষকদের সংঘবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। কিন্তু আমরা দেখলাম, সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপনি হঠাৎ ৪ ডিসেম্বর থেকে আমরণ অনশনে বসলেন কলকাতায়। এর দ্বারা সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি রক্ষার আন্দোলন সিঙ্গুরের জমিতে থাকল না, কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। কৃষকদের মধ্যে ধারণা তৈরি করা হল যে, আপনার ওই অনশনের দ্বারাই চাষিরা জমি ফেরত পাবে, ফলে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল, অনশনের দিকে তাকিয়ে থাকল। ইতিমধ্যে সিপিএম পরিচালিত সরকার ও টাটা মিলে লাঠির জোরে জমির দখল নিল।

নন্দীগ্রামে কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। এলাকার চাষিদের প্রতিরোধের ফলে গুলি চালিয়ে হত্যা এমনকী গণধর্ষণ করেও সরকার ও সালিম গোষ্ঠী জমির দখল নিতে পারেনি। তাহলে, সিঙ্গুরের জমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন করাটাই ছিল সঠিক পথ।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ফলেই ২০১১ সালের নির্বাচনে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটল এবং আপনার নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হল। আপনি সরকারে বসার পরই আমরা প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলাম, এখনই জমিহারা কৃষকরা আন্দোলন করে নিজেরাই নিজেদের জমির দখল নিক। সরকার যেহেতু চাষিদের পক্ষে, তাই পরে সেই দখল বিধিবদ্ধ করে দেবে সরকার। এটাই যথার্থ ও নৈতিক। কিন্তু আপনার সরকার নতুন আইন করার পথে গেল। আমরা আইন করার কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে বলেছিলাম, আইন দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু আমাদের প্রস্তাব শোনা হয়নি। আইনি জটিলতায় কৃষকদের জমি ফেরত অনিশ্চিত হয়ে গেল। জমিহারা কৃষকরা বুঝতেই পারলেন না, কোন অপরাধে তাঁদের প্রতি এই আচরণ করা হল। এই অবস্থায় বিধানসভায় আপনার সর্বশেষ ঘোষণা 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা'-এর মতো দাঁড়াল। যারা আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে একদিন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আপনার দায়িত্ব আপনি এইভাবে অস্বীকার করতে পারেন না। এটা অন্যায়, অনৈতিক।

এমতাবস্থায় সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

# সুপার স্পেশালিটির নামে স্বাস্থ্য পরিষেবাকেই পঙ্গু করে দেওয়া হবে

রাজ্য সরকার বর্তমান সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর বিপুল ঘাটতি পূরণ এবং শূন্যপদে লোক নিয়োগ না করে ক্রমশ এগুলিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। অন্যদিকে উন্নত পরিষেবার নামে রাজ্য জুড়ে নতুন করে ৪১টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল খুলছে। এই সব হাসপাতালের জন্য সুপার স্পেশালিটি দূরে থাক, কোনও স্পেশালিস্ট ডাক্তারও আলাদা করে নিয়োগ করা হচ্ছে না। এর প্রতিবাদ জানিয়ে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, 'সরকার যেভাবে মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসক এবং চিকিৎসক শিক্ষক তুলে নিয়ে তথাকথিত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বহির্বিভাগ চালানোর জন্য পাঠাচ্ছে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত। বর্তমানে চিকিৎসক শিক্ষকের অসংখ্য পদ শূন্য থাকায় প্রায় প্রতি বছরই মেডিকেল কলেজগুলি এমসিআই-এর অনুমোদন হারাচ্ছে। তার উপরে আবার নতুন করে চিকিৎসক শিক্ষকদের তুলে নিলে একদিকে যেমন মেডিকেল কলেজগুলির পঠনপাঠন এবং চিকিৎসা পরিষেবা ভীষণভাবে ব্যাহত হবে, অন্যদিকে কেবলমাত্র মাঝে মধ্যে বহির্বিভাগ চালু করার মধ্য দিয়ে ওই সব হাসপাতাল থেকে মানুষ সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা তো দূরে থাক প্রায় কোনও পরিষেবাই ঠিকমতো পাবে না। ফলে পুরনো এবং নতুন উভয় স্বাস্থ্য পরিষেবাই ভেঙে পড়বে'। তিনি দাবি করেন, মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার তুলে নেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য নতুন করে উপযুক্ত সংখ্যক সুপার স্পেশালিস্ট এবং ট্রেন্ড কর্মী নিয়োগ করতে হবে। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্রও অবিলম্বে সমস্ত শূন্য পদে চিকিৎসক ও কর্মী নিয়োগের দাবি জানান।

*জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড তরুণ নস্করের সমর্থনে দেওয়াল লিখন*

*কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের সমর্থনে দেওয়াল লিখন*

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org